গাজী বাবাজীর দেশ

অজিত পূততুণ্ড

B·P

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী—১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাস
৩৭/৬, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
জহর দাস

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি,
লিপি মুদ্রণ,
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীসুদীপ কুমার মিত্র মহাশয়ের

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

GAJI BABAJIR DESH

A Fiction

By

Ajit Putatunda

এই লেখকের—

টেম্‌স্‌ থেকে তিস্তা

Man, One harmonious soul of many a soul,
Whose nature is its own divine control,
Where all things flow to all as rivers to the sea
Familiar acts are beautiful through love ;

—Shelley

যে দেশের নীলাভ আকাশ জুড়ে সজনের হিম সাদা ফুল ফুটে থাকে, ভাঁট-আশ-শ্যাওড়ার বনে হাওয়ায় কথা হয়, হিজল-বট-তমালের ছায়া পড়ে নীল জলে, ধানের গন্ধ আর কলমীর ঘ্রাণ ভেসে বেড়ায় বাতাসে—সেই দেশই গাজী বাবাজীর দেশ। সেই দেশকে ঘিরেই বর্তমানের এই কাহিনী। এই কাহিনীতে গাজী বাবাজীর দেশের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান কালের জীবন প্রবাহ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

। এক ।

'যাঃ, এ-রকম হতেই পারে না।' ঝক্ঝকে চেহারার মেয়েটি হাসতে হাসতে কথাটা বলল।

'হ্যাঁরে, সত্যি বলছি। শুভ চাটুজ্যে প্রফেসর জে, সির ক্লাসে মেয়েদের নিয়ে পাঁচালী তৈরী করেছিল।' জিভের ডগায় ঝাল-নুন ফেলে চটাস করে একটা আওয়াজ তুলে কথাটা বলল ব্রততী। তারপর ঝাল নুনের স্বাদে মুখটা সামান্য বিকৃত করে চোখের মণি দুটোতে একটা চক্কর লাগিয়ে বলল, 'কাজেই যাকে-তাকে যা-তা বলিস না বাপু। ওদের মধ্যে কে শুভর মতন ডানপিটে ছেলে আছে, কে জানে। শেষটায় বিপদে পড়বি। সবে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিস, কী দরকার উটকো ঝামেলায়।'

ঝকঝকে চেহারার মেয়েটি কোমরে একটা মোচড় দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'কেন? কী এমন অন্যায় কথা বলেছি? আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি, আর ওরা ছেলে হয়ে জন্মেছে বলে সকলের মাথা কিনে নিয়েছে। এই তো। বলার মধ্যে এই তো বলেছি। একথা বলা কি অন্যায়?'

ব্রততী শান্তভাবে মুখের ভেতর কয়েকটা ছোলা ভাজা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই তো। তুই-ও শুভদের ক্লাসের সেই শ্যামলীর মতই কথা-বার্তা বলছিস। মরবি তুই বেবী। শুভ চাটুজ্যের মতন কোন ছেলের হাতে নির্ঘাৎ মৃত্যু।'

ঝকঝকে চেহারার মেয়েটি এবার শব্দ করে হাসল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'শুভ চাটুজ্যেকে তুই চিনিস?'

'চিনি মানে? হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'কি করে চিনলি ?'

'কি করে আবার ! সম্পর্কে ও-যে আমার বোনপো। বয়েসে অবশ্য বড়। এবছর এই কলেজ থেকে অনার্স নিয়ে পাস করেছে। উঃ, ক্লাসে সেই পাঁচালী লিখে কী কাণ্ডটাই না করেছিল।' নুন আর ছোলা ভাজা মুখে পুরে ব্রততী আবার জিভ দিয়ে চটাস করে শব্দ করল। বেবী এবার একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলল, 'ঘটনাটা খুলেই বল্ না, বাবা। কেন হেঁয়ালী করছিস ?'

'তাহলে বলি শোন্।' লুটোনো আঁচলটা কোমরে গুঁজে চোখ মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল ব্রততী। তারপর ঝাল নুন জিভের ডগায় ফেলে কয়েকবার চটাস চটাস আওয়াজ তুলে গল্পটা বলতে শুরু করল ব্রততী। আর বেবী নির্ভেজাল শ্রোতা হয়ে গিলতে লাগল সেই গল্প।

এদিকে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি আর শুভ ওদের গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়ি আর কী !

কলেজের পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে এসেছিলাম আমরা। করিডোর পেরিয়ে লনের দিকে ফিরতেই শুনতে পেলাম ব্রততীর গলা। ওর গলা শুনতে পেয়েই থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুভ। তারপর থামের সঙ্গে নিজেকে সেঁটে নিয়ে আড়ি পেতেছিল তাদের কথায়।

আসলে গল্পটা চলছিল আমাদের নিয়েই। আমি আর শুভ তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। প্রফেসর জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জীর ক্লাসে ঘটেছিল ওই পাঁচালির ঘটনাটা। ঘটনাটা ছিল এই রকম।—

আমাদের ক্লাসে একটি মেয়ে পড়তো, তার নাম ছিল শ্যামলী। দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও, শরীরে বেশ একটা চটক ছিল। গ্ল্যামার-ট্যামার বলতে যা বোঝায় তা-ই। তার ওপর বোম্বাই-এর কোন এক চিত্রাভিনেতার শালী সে। ফলে দেমাকে

মাটিতে পা পড়তো না তার। নাক তুলেই থাকত সর্বক্ষণ। এদিকে ক্লাসের কয়েকটি হ্যাংলা ছেলে তার কাছে-পিঠে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াতো। একদিন তো তাই নিয়ে ক্লাসের এক প্রফেসরকে নালিস করেই বসল মেয়েটি। তাছাড়া ছেলেদের দিকে এমন করে তাকাত, যেন তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য জীব। জিভের ডগায় 'ব্রুট' বা 'আনকালচার্ড' জাতীয় দু'চারটে আলগা শব্দ যে কখনো সখনো বেরিয়ে না আসত তা-ও নয়। ফলে ক্লাসের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

একদিন ফিজিক্স-এর ক্লাস চলছে। প্রফেসর জে, সি ক্লাস নিচ্ছেন। তাঁর সামনে টেবিলের ওপরে নানান আকারের কাঁচের পাত্র সাজানো। একটা কাঁচের নল দিয়ে পাত্রগুলো জোড়া। জে, সি জলের ধর্ম বোঝাচ্ছেন। বলছেন, জলের কোনো আকার নেই, তাই সে পাত্রের আকার ধারণ করে। বলছেন, জলের ধর্ম, সব সময় একই লেভেলে থাকা পাত্রের আকৃতিতে তার পরিবর্তন হয় না'। জলের 'প্রচণ্ড শক্তির কথাও বলছেন জে, সি। সবাই মন দিয়ে শুনছে। এদিকে আমার পাশে বসে শুভাশিস কবিতা লিখে যাচ্ছে। সেই কবিতা পড়ে আমি হাসি সামলাতে পারছি না। হঠাৎ জে, সির দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর। তিনি পড়া থামিয়ে বললেন, 'ওহে তোমাদের ব্যাপার কি? কি নিয়ে এ্যাতো ব্যস্ত তোমরা?'

শুভাশিস দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে বলল, 'কবিতা, স্যার।'

'কবিতা মানে?' ভুরু কুঁচকোলেন প্রফেসর।

'ঠিক কবিতা নয়। বলতে পারেন পাঁচালী।' অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলল শুভ। যেন ফিজিক্স-এর ক্লাসে পাঁচালী লেখা কোনো অন্যায় ব্যাপার নয়। জে, সি কিছু বলবার আগেই আবার বলল, 'মানে জলের ধর্ম নিয়ে চারটে লাইন লিখেছি স্যার।'

জে, সি এবার হেসে সহজ ভাবে বললেন, 'মাই গুডনেস,

জলের ধর্ম নিয়ে পাঁচালী। তা' বেশ। শুনি তোমার পাঁচালী।'

ক্লাসের সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল শুভাশিসের দিকে। শ্যামলীও বাদ গেল না। তখনো কেউ জানে না, ব্যাপারটা কী ঘটতে যাচ্ছে। শুভাশিস পাঁচালীর সুরেই পড়তে শুরু করল—

নারীর আর বারির ধর্ম জানিবে সমান।
দু'এরই আকার নাই রয়েছে প্রমান॥

দু'টো লাইন পড়তেই ক্লাসে সকলের মধ্যে কেমন একটা উসখুস ভাব দেখা দিল। অনেকের চোখে মুখে ফুটে উঠল চাপা হাসি। মেয়েরা যেন একটু নড়ে চড়ে বসল। প্রফেসর জে, সি হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'জলের ধর্ম বলতে গিয়ে আবার মেয়েদের টেনে আনলে কেন?'

শুভাশিস মুখে একটা নিরীহ-নিরীহ ভাব ফুটিয়ে বলল, 'সামান্য উপমা স্যার কী। বলে আবার পড়তে লাগল—

যে পাত্রে রাখো তা-ই জলের আকার।
পুরুষেই জানিবে তেমনি নারীর বাহার।

চাপা হাসিটা এবার খুক খুক কাসিতে পরিণত হল। শুভাশিস পড়েই চলল—

অন্য ধর্ম যদি দ্যাখো জেনে রাখো মনে।
সে মেয়ে মেয়েই নয় শুভাশিস ভনে॥

পড়া শেষ হতেই চাপা-হাসিটা বোম-ফাটা হাসিতে রূপ নিল। আর সেই হাসির মধ্যেই শ্যামলী একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাল্‌গার! মেয়েদের নিয়ে এসব রসিকতা ভাল্‌গার ছাড়া কিচ্ছু নয়। আই স্ট্রংলি প্রোটেস্ট।'

প্রফেসর চ্যাটার্জী কোনো রকমে ব্যাপারটাকে সামাল দিলেন। কিন্তু ক্লাস শেষ হতেই অবস্থাটা বেসামাল হয়ে গেল। ছেলেরা শ্যামলীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, 'অন্য ধর্ম যদি দ্যাখো জেনে

রাখো মনে, সে-মেয়ে মেয়েই নয় শুভাশিস ভনে।' ক্রমশঃ গোটা কলেজেই ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে, শ্যামলীর পক্ষে কলেজে আসাই দায় হয়ে পড়ল। ফলে একদিন কলেজই ছাড়তে হল ওকে।—

গল্পটা শেষ করে ব্রততী চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বুঝলি, এই হল শুভর পাঁচালী।'

বেবী হাসি মুখে ছোলা চিবোতে চিবোতে বলল, 'তোর শুভ চাটুজ্যে একেবারে বিচ্ছু বল্?'

বেবীর কথা শেষ হতে না হতেই শুভাশিস দমাস করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হল এবং চাপা হুঙ্কার দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'আজ্ঞে না ম্যাডাম। শুভ চাটুজ্যে একজন সাদা-সাপ্টা জেণ্টল্‌ম্যান।'

শুভাশিসের আচমকা আবির্ভাবে দুই সখী কেমন ভড়কে গেল। দুজনের মুখ দিয়েই বেমক্কা বেরিয়ে গেল, 'অসভ্য!' পরক্ষণেই ব্রততী বলে উঠল, 'ওমা, তুমি! নাম করতে করতেই হাজির।'

'কিন্তু ছুটকি মাসী, তুই আমার বিরুদ্ধে এ-রকম অপপ্রচার শুরু করেছিস কেন? মতলব কী? বন্ধুদের আমার ওপর বিগড়ে দেওয়া?'

'হ্যাঁ, তাইতো। তুমি যা ছেলে।' হাসিমুখে বলে ব্রততী।

আমিও ততক্ষণে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি। আমাকে দেখে ব্রততী বলে উঠল, 'ওবাবা রথীদাও আছ দেখছি।' তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তাই তো ভাবছি, শুভ মামা থাকবে, অথচ রথীদা থাকবেনা, তাই কখনো হয়?'

শুভাশিস শরীরে একটা মোচড় দিয়ে ঝটপট বলল, 'হয় না বলেই বাঁচোয়া। 'নইলে তোর মতন কাঁটা ঝোপের প্রশংসা করতো

কে বল ?'

'কাঁটা ঝোপ !' ব্রততীর গায়ে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল বেবী। ব্রততীও হাসতে লাগল, 'দেখছিস তো শুভ চাটুজ্যে কী জিনিস।'

বেবী সে কথার উত্তর দেবার আগেই শুভ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলি রথী, আজ কলেজে না এলে একটা দারুন জিনিস মিস করতাম।'

'কী জিনিষ ?' আমি ওর কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

শুভাশিস ঠোঁটটা উল্টে বেবীর দিকে একবার তাকাল। তারপব কোন গোপন কথা বলার মতন করে ফিস ফিসিয়ে বলল, 'একজন সুন্দরী এবং মার্জিত রুচির মেয়ের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেতাম না।'

'ঠাট্টা করছেন ?' বেবী একটু গম্ভীর হয়েই শুভাশিসের কথার পিঠে পিঠে প্রশ্ন করল।

শুভাশিস গলায় সহজ সুরের ঝরণা ঝরিয়ে বলল, 'ট্রুথ ইজ ট্রুথ। এর মধ্যে ঠাট্টা তামাসার অবকাশ কোথায় বলুন ? বরং আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, আমার কথাটা মিথ্যে বলে আপনাব মনে হয় ?'

বেবী কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্ত তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

সেই প্রথম আলাপ। হাল্কা মিহি সুরের মধ্যে যে আলাপের শুরু, সেই আলাপটা একদিন কেমন করে যেন গম্ভীর-গাঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-কথা এখন নয়। পরের কথা পরে বলাই ভালো। নইলে ভুল চুক থেকে যাবার সম্ভাবনা। গম্ভীর গাঢ় সুরের কথা তাই তোলা রইল এখন।

তা প্রথম আলাপের জড়তা কাটতে দু'দিনও লাগেনি

আমাদের। এবং সে জড়তা কাটতে না কাটতেই আমাদের ছোটার নেশায় পেয়ে বসেছিল। ছোট বড় ছুটি-ছাটায় আমরা বেরিয়ে পড়তাম ঘরের বাইরে। বাইরের টানটাই তখন বড করে দেখা দিয়েছিল আমাদের সামনে। ফুটি-ফাটা রোদ্দুর, ছলাৎ-ছলাৎ বর্ষা, হিম-হিম শীত, কোন কিছুই আমাদের ঘরে বেঁধে রাখতে পারত না। বাইরে ছোটার বেগটাই যেন আমাদের অন্তরের আবেগটাকে ধরে টান দিয়েছিল। ছোটার গতিতে তাই পড়তে পডতে খুলে যাচ্ছিল মনের পরদা। হাট হয়ে যাচ্ছিল মনের দরজা জানলা। আমরা ক্রমশঃ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসছিলাম।

তবে এই ছুটোছুটির মধ্যেও ব্রততীর কেমন একটু পিছুটান ছিল। সব সময় হৈ-চৈটা ঠিকঠাক পছন্দ করত না সে। অকারণেই খুঁত খুঁত করত তাই।

ব্রততী একদিন আমাকে বলল, 'আমাদের মত গরীবের এই ঘোড়া রোগ মানায় না।'

'মানে?' ওর কথায় আমি অপ্রস্তুত না হয়ে পারি না।

উত্তরে ব্রততী ম্লান হেসে বলল, 'আমাদের পরিবারের সব কিছুই তোমার জানা। কী আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটে তা-ও তোমার অজানা নয়। বেড়াবার খরচটা অবশ্য তুমি এবং বেবীই বহন করো। তাহলেও আমাদের পক্ষে এটা ঠিক উচিত নয়। তাই বলছিলাম গরীবের ঘোড়া রোগ।'

ব্রততীর কথায় খুব খারাপ লাগল আমার। বললাম, 'ব্রতী, তুমি এভাবে কথাটা বললে? আমরা সবাই একসঙ্গে আনন্দ করে ঘুরে বেড়াই। এর মধ্যে খরচা বহনের প্রশ্ন তুললে তুমি? তুলতে পারলে?'

আমার কথায় ব্রততী বলল, 'না, ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। আসলে কী জানো, দিদির জন্যে মনে মনে বড় কষ্ট পাই। দিদি

জীবনে কিছুই পেল না। শুভর বাবা তো সেই কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। নিরুদ্দেশ হবার অনেক আগে থেকেই তার কোনো আয় ছিল না। তখন থেকেই দিদি স্কুলমাস্টারী করে সংসার চালাচ্ছে। এদিকে আমি কোথাকার কে? দূর সম্পর্কের এক মাসতুতো বোন বৈ তো নয়। ছেলেবেলায় বাপ-মাকে হারাবার পর কোথাও কোন ঠাঁই হল না। কোন আত্মীয় স্বজন রাখতে চাইল না আমাকে। এমন কী পয়সা ওয়ালা মামারাও দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। তখন এই দিদিই তো আমার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। দিদি আমার কাছে তাই মায়ের মতন। কিন্তু দিদি যেন আর খাটতে পারছে না। শরীরে কুলোচ্ছে না আব। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোনো রকমে নিজেকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। মনে হয় দিদি খেটে খেটে সারা হচ্ছে আর আমি কেবল মজা করে বেড়াচ্ছি। দিদির কোনো কাজেই লাগছি না। তুমিই বল খারাপ লাগে কিনা?'

'কিন্তু তুমি তো পড়াশুনা করছো। পড়া শেষ করে যখন চাকরী করবে তখন নিশ্চয়ই দিদিকে সাহায্য করবে। তার জন্যে এখন থেকে উতলা হয়ে তো লাভ নেই। সময়ের আগে কোনো কিছুই তো হয় না।'

'তা ঠিক।' ব্রততী ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

আমাদের কথা হচ্ছিল কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। আমাদের চারজনেরই জড়ো হবার কথা ছিল। কিন্তু তখনো বেবী এবং শুভাশিস এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু ব্রততীর কথা শেষ হতে না হতেই বেবী এবং শুভাশিস এক সঙ্গেই এসে উপস্থিত হল। ওদের এক সঙ্গে দেখে আমি হেসে শুভকে বললাম, 'কীরে তোরা এক সঙ্গে জুটি বাঁধলি কোথায়?'

'মোদের পথ বেঁধে দিল গ্রন্থী।' আমার কথার উত্তরে কাব্যিক মেজাজে উত্তর দিল শুভাশিস।

বেবী হেসে বলল, 'পথই বটে। কী হয়েছে শোনো। বাড়ি বেরিয়েই দেখি, রাস্তার মোড়ে শুভ চাটুজ্যে উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এক সঙ্গে কলেজ স্ট্রীট যাব।' তারপর বলল, 'ভাবছি, আগামী রবিবার ক্যানিং থেকে লঞ্চে করে বাসন্তি গোসাবা বেড়াতে যাব। কিন্তু তোমাকে আগে থেকে কনভিন্স করতে না পারলে ওদের ভোট পাব না। তাই বাড়ির দোর গোড়াতেই তোমাকে ধরলাম।' বলে বেবী আবার হাসল।

বেবীর কথার পিঠে পিঠেই ব্রততী বলে উঠল, 'উহু, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই।'

'কেন? তোর আবার কী হল?' ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে প্রশ্ন করল শুভাশিস।

'না বাপু, আমি তোমাদের মতো এ্যাত ট্যাঙোস-ট্যাঙোস করে ঘুরতে পারব না। আজ এখানে কাল সেখানে। বাপ্‌রে বাপ্‌।' চোখ নাচিয়ে বলেই চলল ব্রততী, 'চলো, বারুইপুর। কী? না, এখানে আটিসারায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, কাজেই তাঁর পদরেণুর স্পর্শ পেতে হবে। আবার ছোটো ঘুটিয়াশরীফ। কেননা, বাংলার গৌরব, রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মদন রায় স্বয়ং এই গাজী সাহেবের গুণমুগ্ধ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের তীর্থ হিসেবে আজো সেই ঐতিহ্য কেমন করে বয়ে চলেছে তা দেখতে হবে। কেবল কী তাই? ট্রেন বাস ঠেঙিয়ে আবার ছোটো। কোথায়? না, আঁটপুর। সেখানে কী? না, বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির উদাহরণ পোড়া মাটির কাজ করা মন্দির। কে জানে বাবা, তোমরা হয়তো কোন্‌ দিন বলে বসবে, চলো বিষ্ণুপুর যাই, কিংবা যাই গৌড়ে। বাংলার গৌরব-টৌরব তোমরাই উপভোগ করো বাবা। আমার ওসবে কাজ নেই।' বলে সে দু'হাত তুলে, নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকাল।

ব্রততীর ভঙ্গি দেখে আমরা হেসে ফেললাম। আমরা মানে, আমি আর বেবী। শুভাশিস কিন্তু হাসল না বরং অদ্ভুত গাম্ভীর্য নিয়ে অভিনয়ের ঢঙে বলতে লাগল, 'হায় বঙ্কিম! তুমি যদি আজ বেঁচে থাকতে তাহলে এই মূঢ় নারীর জন্যে তোমার রাগ বা দুঃখ হত না। হত অনুকম্পা। তুমি সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলে বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। অনুতাপ করে বলেছিলে, যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদির মতন নগর ছিল, যে দেশ উদয়ন আচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের মতন মহাপুরুষের জন্মভূমি সে দেশের ইতিহাস নাই। তুমি সকল বাঙালীকে আহ্বান করে বলেছিলে, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। কিন্তু হে ঋষি, এই মূঢ় নারী নিজের সম্বন্ধেও জানতে চায় না। ইতিহাস সম্বন্ধে এর কোন কৌতূহল নেই। কাজেই এই মূর্খ নারীকে তুমি ক্ষমা করো।'

ব্রততী হেসে বলল, 'যতই ভজাবার চেষ্টা করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। নেই-নেই-নেই।'

কিন্তু যতই নেই-নেই করুক ব্রততীও শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল মামাদের সঙ্গে। তবে সেবার ক্যানিং গোসাবা যাওয়া হয়নি। গিয়েছিলাম ফলতা।

কলকাতার অদূরে বিস্তৃত গঙ্গার পাড়ে নির্জন নিরিবিলি জায়গাটা বেশ লাগল। কাছেই একেবারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে স্যার জগদীশ বসুর বাড়ি। এখানে এখন কে থাকেন তা' অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে বাগান-টাগান সুন্দর ঝকঝকে। শুভাশিস বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর কতকটা আপন মনেই আউড়ে গেল, 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' বেবী ওর পেছনে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল, 'মহাদেবের জটা হইতে, শুভাশিস আগের মতই সামনে দৃষ্টি মেলে দিয়ে শান্ত ভাবে বলল, 'কোথায় যাও?' বেবী হাসি হাসি মুখ করে বলল,

'মহাদেবের পায়ে।'

আমি ওদের কথার ফাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'জগদীশ বসু হয়তো এখানে বসেই ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের কথা ভেবেছিলেন।' কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই শুভাশিস তুম করে ঘুরে বেবীর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'গুড বেবী গুড। হাণ্ড্রেডে, হাণ্ড্রেড।'

ওখান থেকে সামান্য কিছু দূর এগোলেই একটা পুরোনো দুর্গ। গঙ্গা পাড়ের রাস্তা ধরে আমরা সেই দিকে এগোলাম।

দুর্গের এক দিক দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। বাকী তিন দিকে এক সময় চওড়া খাল দিয়ে ঘেরা ছিল। সে-খাল এখনো হাজা-মজা অবস্থায় আছে। খালের ওপব একটা লোহার পুল পাতা। দুর্গের প্রবেশ পথের সঙ্গে যুক্ত। পুলটা তুলে দিলেই বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। লোহার শেকল দিয়ে কপিকলের সাহায্যে এক সময় যে এই পুল ওঠানো নামানো হত তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। সেই শেকল, সেই চাকা এখনো আছে। অবজারভেটরি টাওয়ারটাও ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে এখনো। তবে দুর্গের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবই প্রায় গাছ পালায় ঢেকে গেছে। কোন রকমে সে অতীতের স্মৃতিকে বহন করছে যেন।

আমরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগোতেই দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উল্টো দিক থেকে আসছেন। সাদা দাড়ি আর লম্বা চুলে ভদ্রলোককে কতকটা রবীন্দ্রনাথের মতন দেখতে লাগছে। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে চমকে ওঠার মতন। ভদ্রলোকের পরণে ধুতি এবং ঢোলা পাঞ্জাবী। কাঁধ থেকে একটা ঢাউস সাইড ব্যাগ ঝুলছে। সেই ব্যাগ থেকে কতগুলো ছোট ছোট চারা গাছ উঁকি দিচ্ছে। হাতেও দু' একটা গাছ। গলায় কালো ফিতের সঙ্গে ঝুলছে একটা বায়নো-কুলার। বৃদ্ধের পেছনে অল্প বয়স্ক একটি গ্রাম্য লোক। তার মাথায় একটা ঝুড়ি, তাতে অনেকগুলো চারা গাছ।

দূর থেকে ভদ্রলোককে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বেবী। অস্ফুট স্বরে বলল, 'আরে ডঃ গোলাম আলি যে! এমন রবীন্দ্রনাথ মার্কা চেহারা ওঁর ছাড়া আর কার হবে? কিন্তু এখানে উনি কী করছেন?'

'ডঃ গোলাম আলি মানে? সেই বিখ্যাত বোটানিষ্ট?' প্রশ্ন করল শুভাশিস।

'হ্যাঁ, বোটানিষ্ট এবং দার্শনিক। ওঁর ছাত্ররা ওঁকে সেণ্ট আলি বলে ডাকে। উনি সম্পর্কে আমার বাবার দাদা হন। সেই সূত্রে বড় কাকা বলে ডাকি। কলকাতায় কলেজে যখন প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন বাবার কাছে খুব আসতেন। তারপর তো আমাদের বাড়ির সব অন্যরকম হয়ে গেল। আর উনিও বিদেশে বিদেশেই ঘুরতে লাগলেন। বিয়ে-টিয়ে করেন নি তো। এখানে ওঁকে যে দেখতে পাব তা' ভাবতেই পারছি না।' বলল বেবী।

'কিন্তু কাগজে যেন একটা খবর বেরিয়েছিল, ডঃ আলি বাংলার বন সম্প্রসারণে উৎসাহী হয়েছেন।' শুভাশিষের কথাটা শেষ হতে না হতেই ডঃ আলি আমাদের সামনে এসে পড়লেন। এলোমেলো মাথার চুলে চিরুণি পড়েনি কত দিন কে জানে। পাঞ্জাবীতে বোতাম নেই। চোখ দুটোতে শিশুর সারল্য। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। কেবল আমরা ক'জন। আমরা ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন।

বেবী ওঁর একটা হাত দু'হাত দিয়ে ধরে হাসি মুখে বলল: 'বড় চাচা, আমাকে চিনতে পারছেন?'

ডঃ আলি বেবীর চোখে চোখ রাখলেন। ভুরু-কুঁচকে সামান্য সময় ভাবলেন। হয়তো নিজের ভাব-জগত থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল একটু। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন 'আরে রোশেনারা, তুই! বাপরে, কত বড় হয়ে গেছিস।'

'কিন্তু আপনি তো বিলেতে ছিলেন, এ-দেশে এলেন কবে ?'

বেবীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সস্নেহে হাতের চারা গাছগুলোর দিকে তাকালেন। এমন ভাবে তাকালেন যেন কৌতুকের সঙ্গে কতকগুলো শিশুর খেলা দেখছেন। তারপর বললেন, 'বলতে পারো বাংলার ডাকে চলে এলাম।' বলেই তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এরা কারা ? এখানে বেড়াতে এসেছিস নাকি ?'

বেবী ডাঃ আলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়ের পালা শেষ হলে ডঃ আলি বললেন, 'চলো না আমার বাগান দেখতে যাবে। আমার কচি শিশুদের দেখতে পাবে সেখানে।'

আমরা এক কথায় রাজি। ডঃ আলির সঙ্গে চললাম।

গঙ্গার এক ধারে বাগান। বাগানের শেষ প্রান্তে ছোট একটা ছিমছাম পাকা বাড়ি। বাড়ি বলতে মাত্র দু'খানা ঘর। নানা জাতের লতাপাতায় ঘেরা। একটা কুঞ্জবনের আমেজ যেন। বাগানে ছায়া দেবার মত দু'একটা গাছ ছাড়া বড় গাছ একটাও নেই। সর্বত্র ছোট চারা গাছ। অবশ্য বড় গাছের জাত। ডঃ আলি বাগানে ঢুকে আমাদের ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন, 'আজ এদের এমনি শিশু দেখছো তো, একদিন ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।' এদিকে ওদিকে ঘুরে কারো পাতা ধরে, কাউকে সামান্য ছুঁয়ে আদর করার ভঙ্গি করে বলতে লাগলেন, 'এটা শিরিষ, এটা অশোক, এটা শাল, এটা সেগুন, এটা গাম্বিল, এটা জারুল, এগুলো আম, এগুলো নারকেল' বলতে বলতে একটা ছায়া মত জায়গা বেছে নিয়ে মাটির ওপরই বসে পড়লেন। আমরাও বসলাম তাঁর সামনে। তারপর সেই গ্রাম্য গোছের লোকটিকে ডেকে বললেন, 'তপন, এদের সবাইকে এক একটা ডাব কেটে দে তো।'

ডঃ আলি বললেন, বুঝলে বাবারা, মানুষের মত এমন আহাম্মক জীব বুঝি আর নেই।

আমরা তাঁর কথা বুঝতে না পেরে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম।

ডঃ আলি নিজেই আবার বললেন, 'লোক মজা করে বন কেটে বসতি গড়ছে। গাছ কাটার সময় ভাবছে, বুঝি, প্রকৃতিকে খুব ফাঁকি দিচ্ছি। আরে বোকারা, প্রকৃতিকে কি ফাঁকি দিবি? ফাঁকিতে তো তুই নিজেই পড়ছিস। প্রকৃতির রাজ্যে ব্যালান্স নষ্ট করলে, তার হিসেব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে নেবে না? এক আহাম্মক হয়তো ভাবল, বন কাটছি বলে আমার তো কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। কবে কার কী ক্ষতি হবে তাতে আমার কী? ভাবো, কেমন মূর্খ।'

একটু থেমে চুলে দাড়িতে সামান্য হাত বুলিয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'বৃক্ষ হল সর্বংসহ। তার ওপর যা কিছু করো, টু শব্দটি নেই। কাটো, ছেঁড়ো, ফাড়ো। টু শব্দ নেই বলে সে কি কিছু বোঝে না? বোঝে, খুব বোঝে। সে মনে মনে বলে, কাট বাবা কাট। ফার্নিচার বানা, কড়ি বরগা তৈরী কর্। তারপর আকাশে যখন মেঘ করবে, বর্ষার ঢল নামবে নীচে, তখন কোথায় থাকবে তোদের ফার্নিচার, আর কোথায় থাকবে তোদের ঘর-দোর? বন্যার হাত থেকে বাঁচবি কি করে তখন?'

তাঁর কথার মধ্যেই ডাব এসে গেল। তিনি বললেন, 'এ হল জননীর আশীর্বাদের মতন। এমন তৃপ্তি আর কোন কিছুতে পাবে না। খাও বাবারা।'

ডঃ আলি বলতে লাগলেন, 'বুঝলি, রোশেনারা, আমি তখন লণ্ডনে। গাছের কতকগুলো রোগ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে মসগুল হয়ে আছি। এমন সময় এক পুরোনো বন্ধুর দেখা পেলাম। ভদ্রলোক অরনিথোলজিস্ট। পাখি টাখি নিয়ে চর্চা করেন আর

কী! বন্ধুটি বললেন, আলি, এখানে বসে দিব্যি গাছের পোকা বাছছো, কিন্তু এদিকে তোমার দেশের লোক যে বনের পর বন কেটে মরুভূমি করে দিচ্ছে, সেদিকটা নিয়ে একবারও ভেবে দেখেছো? নেচার দারুন সেনসিটিভ। এর পেনাল্টি একদিন দিতে হবে কিন্তু। বুঝলে, বাবারা, সেই মুহূর্তে আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। ল্যাবরেটরির গণ্ডি ছেড়ে ছুটে এলাম। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে লিখলাম। লিখলাম, অন্যান্য স্টেট গভর্ণমেণ্টকে। কিন্তু কেবল লিখে কী হবে! আমার প্রত্যেক ছাত্রকে ধরে ধরে বলতে লাগলাম, তোমরা প্রতিজ্ঞা করো, প্রত্যেকে সপ্তাহে অন্ততঃ একটা করে বড় জাতের গাছের চারা লাগাবে এবং অন্তত দশ জনকে এ-ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। আমি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাছ লাগাচ্ছি। অনেকে যেচে আমার কাছ থেকে গাছের চারা কিনে নিয়ে গিয়ে লাগাচ্ছে। অনেকে আবার আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।'

একটু থেমে ডঃ আলি চোখ বুজে কতকটা আপন মনেই বলে চললেন, 'টোটাল ল্যাণ্ড এরিয়ার অন্ততঃ থারটিথি পারসেণ্ট বন থাকার কথা। সে-জায়গায় এখানে টুয়েন্টি পারসেণ্টও নেই। তারও ওপর গাছ কেটে চলেছে। উঃ, কী আহাম্মকী! হবে না কেন? বনের পাহারাদার হিংস্র প্রাণীদের মেরেই তো সাফ করে দিচ্ছে। বনকে বাঁচাবে কে? নাঃ, এরা বংশধরদের কথা কিছু ভাবে না।' বলেই তাঁর কী খেয়াল হল, বেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, তোর মা এখন কেমন আছে?'

খুব, সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটার আড়ালে অসাধারণ কোন কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল। বেবীর মুখটা তাই হঠাৎ কেমন কালো হয়ে গেল। উত্তর দিতে সামান্য সময় লাগল তার। তারপর বলল, 'ভালোই আছে।'

ডঃ আলি আর কিছু বললেন না। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু তোমরা তো কোন কথা বলছো না।'

শুভাশিস বলল, 'আজ্ঞে, আপনার কথা শুনছি। কেবল কথাই শুনছি না। আপনাকেও দেখছি। আপনার সঙ্গ পাওয়া মানে তো একজন ঋষির সঙ্গ পাওয়া। সচরাচর ভাগ্যে তো এমন হয় না।'

ডঃ আলি বাধা দিয়ে বললেন, 'না-না। ঋষি-টিসি বলে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করো না। বরং আমার কাজটাকে ভালোবাসার চেষ্টা করো। তোমরা তো ছুটিতে গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়ো। গ্রাম দেখতে গিয়ে প্রত্যেক জায়গায় কিছু করে চারাগাছ লাগাও না কেন? এবার থেকে তাই করবে। 'করবে তো?'

আমরা সবাই সম্মতি জানালাম। ঋষিতুল্য মানুষটি ছেলে মানুষের মত খুশি হয়ে উঠলেন।

আমরা তখন উঠব-উঠব করছি। এমন সময় সেই তপন নামের লোকটা বলল, 'কর্তা, সেই সমস্যাটা না মেটালে তো চলছিনি। দাদা এই এইলো বলে। একটা যুক্তি তো চাই।'

ডঃ আলি হা-হা করে খানিকটা হাসলেন। তারপর বললেন 'এ যে বড় অদ্ভুত সমস্যারে। এ সমস্যার উত্তর কেবল বঙ্গজননী স্বয়ং দিতে পারে। সত্যি, ইণ্টারেস্টিং প্রবলেম।' বলে ডঃ আলি আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বললেন। যা বললেন, তার অর্থটা এই রকম—তপন নূরপুরের কাছে আখরাপুঞ্জি অঞ্চলে থাকে। ওরা হাফ মৃৎশিল্পী। পুরুষানুক্রমে হিন্দুদের প্রতিমা গড়ছে। নিজেরা কিন্তু বেশীর ভাগই মুসলমান। হালে ওদের কিছু কিছু হিন্দু হয়েছে। এই তপনও তার মধ্যে একজন। ওর মা-বাবাও হিন্দু। কিন্তু ওর দাদা মুসলমান। ওর বাবা থাকে দাদার কাছে। সেখানে বাবা প্রায় মর-মর। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, ওর বাবা মারা গেলে কী ভাবে সৎকার করা হবে? হিন্দু মতে, না মুসলমান মতে? ওর দাদা অশৌচ-ই বা পালন করবে কী করে? এক এক জন এক এক রকম মত দিচ্ছে। তাই ওরা সমস্যায় পড়েছে।

সত্যিই অদ্ভুত সমস্যা। আমরাও হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বৃদ্ধ হাসতে লাগল। তপন অসহায়ভাবে বলল, 'একটা যুক্তি তো দিতেই হবে কত্তা।'

যুক্তিটা কী দাঁড়াল সেটা শোনার জন্যে আমরা আর অপেক্ষা করিনি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে উঠে পড়েছিলাম। উঠবার সময় আলি সাহেব বলেছিলেন, 'ক'দিন এখানে আছি ঠিক নেই। তবু যদি পারো, মাঝে মাঝে চলে এসো।

ফিরবার সময় অন্য সব বারের মতন হৈচৈ করেই ফিরেছিলাম আমরা। তবু কেন জানি না, একটা শব্দ আমার কানের পর্দায় বার বার কাঁটার মত বিঁধছিল। শব্দটা আর কিছুই না, রোশেনারা নামটা।—বেবীর যে পোশাকী নাম রোশেনারা তা' আমার অজানা ছিল না। তবু ডঃ আলির মুখ থেকে যখন নামটা শুনলাম, তখন যেন কি এক অস্বস্তি মনের আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে অস্বস্তির কারণ অবশ্য বুঝতে পারিনি। বুঝতে পেরেছিলাম পরে। পরবর্তী কালে বেবী নামটার চেয়ে ওর রোশেনারা নামটাই আমার ভালো লাগত বেশী।

। দুই ।

এর মধ্যে আমাদের চলার গতি সামান্য শ্লথ হয়েছিল। তার কারণ, পরীক্ষার খাঁড়াটা এসে ঝুলে পড়েছিল আমাদের মাথার ওপর। কাজেই সাময়িক ভাবে ছোটাছুটিটা বন্ধ রাখতে হয়েছিল আমাদের। ব্রততী এবং বেবী অবশ্য কলেজের পাটই চুকিয়ে দিয়েছিল। বেবী হাতের কাছে একটা আধা সরকারী অফিসে চাকরির সুযোগ পেয়ে সেটাকে আর হাতছাড়া করেনি। কেবল তাই না। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ব্রততীকেও ঢুকিয়ে নিয়েছিল সেখানে। ফলে শুভর মার কাছে বেবীর খাতির বেড়ে গিয়েছিল অনেক গুণ। বেবীর আবদার ঝট করে ফেলতে পারতেন না তিনি।

পরীক্ষার পর আমাদের শ্লথ জীবনটা অবার যখন গতিময় হয়ে উঠেছিল, তখন ব্রততীর গতিবেগটা ক্রমশঃ কমে আসছিল যেন।

সেবার দীঘা যাওয়া ঠিক হল। কিন্তু ব্রততী বেঁকে বসল। বেবী কোন কথা শুনল না। সোজা চলে গেল শুভর মার কাছে। আমরাও অবশ্য ওর সঙ্গে ছিলাম।

শুভর মা তখন পূজাহ্নিক সেরে সবে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। পূজোর ফল স্বরূপ চোখে মুখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য লেগে রয়েছে তখনো। বেবীকে দেখে তিনি বললেন, ‘কীরে পাগলী মেয়ে, কী ব্যাপার?’

‘একটা আবদার আছে দিদি।’ বেবীর গলায় ছেলেমানুষী সুর ফুটে উঠল।

শুভর মা হেসে বললেন, ‘বল্ না, কী আবদার। তোর কোনো কথা কি ফেলেছি?’

'আমরা দীঘা যাব ভেবেছি, কিন্তু ব্রততী কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। ওকে যেতে বলুন না।'

শুভর মা হেসে বললেন, 'ও মেয়ে ওই রকম। দিদিকে সুখী করবার জন্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সব সময়। আরে বোকা, এই সময় হৈচৈ না করলে আর কবে করবি? বুড়ো বয়সে? যাবে ও। আমি বলছি যাবে।'

অতএব আনন্দে গম-গম করতে করতে আমরা দীঘা গিয়ে উঠলাম। সারা দিন এবং একটা রাত্তিরের জন্য থাকা। দু'কামরার একটা কটেজ ভাড়া পাওয়া গেল। রাত্রে কিন্তু শোওয়া হল না কারো। খাওয়া দাওয়ার পর শুভর মাথায় হঠাৎ সাগর দেখার বাসনা চাগিয়ে উঠল। রাত্রের সমুদ্র না দেখলে নাকি জীবনই বৃথা। কাজেই শোবার ব্যাপারটা মুলতবী রেখে আমরা ছুটলাম বীচের দিকে।

বীচ তখন প্রায় ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই হয়। আমাদের মতন উদ্ভট স্বভাবের দু'একজন মানুষকে দূরে দূরে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। এদিকে রাত্রের সমুদ্র তখন ফুলে ফুলে উঠছে। ঝাউবনে আছড়ে পড়ছে তার ফোঁস-ফোঁসানির শব্দ। ঝক-ঝকে নীল আকাশে লেপ্টে থাকা বিশাল চাঁদটা অকৃপণ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। সে আলোয় ফুঁসে ওঠা সমুদ্র, উথাল পাতাল ঝাউ বন এবং টান-টান পড়ে থাকা বেলা ভূমি—একাকার হয়ে যাচ্ছে। নির্জন প্রকৃতির বিশাল বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে আমরা কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বেবী ব্রততীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কী-রে ভালো লাগছে না?'

'খু-উ-ব।' ব্রততী ঘাড় হেলিয়ে বলল।

'তাহলে? তাহলে আসতে চাইছিলি না-যে?' একটু থেমে আবার বলল, 'যে-দিনটা চলে যায় সে কী আর ফিরে আসে? যে যায় চির কালের জন্যেই যায়। কাজেই দিনটা থাকতে তাকে পরিপূর্ণ

ভাবেই গ্রহণ করা উচিত।'

ব্রততী কোন উত্তর করল না।

আমরা কাছাকাছি অথচ সামান্য ছড়িয়ে বসলাম। ব্রততী সব থেকে দূরে। আমি আর বেবী খুব কাছাকাছি। আমাদের দুজনের ঠিক সামনে কোণাকুণি করে বসল শুভাশিস।

আমি বেবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এমন খোলামেলা প্রকৃতির রাজ্যে এসে পড়লে নিজেকে হঠাৎ মুক্ত বলে মনে হয়। মনে হয়, সংসারের কোনো বাঁধন বুঝি আর আমাকে আটকাতে পারবে না। এ-সব পরিবেশে এটাই তো নীট লাভ। কী বলো?'

বেবী উত্তর না দিয়ে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করল। শুভাশিস 'মুক্তি' শব্দটা বার দুই উচ্চারণ করল। শব্দটা জিভে নিয়ে তার আস্বাদ পেতে চাইল যেন। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, 'কী জানি কেন, এই মুহূর্তে হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবাও একদিন মুক্তি চেয়েছিলেন। সংসার থেকে মুক্তি।'

আমরা দুজন কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। ব্রততী খুক খুক করে দু'বার কাশল।

শুভাশিস বলল, 'বেবী, তুমি আমাদের সংসারের অনেক কিছুই জানো, আবার অনেক কিছুই জানো না।'

বেবী শুভর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বলল, 'কী?'

সামনে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে শুভ বলল, 'আমার বাবা যে নিরুদ্দেশ তা' তুমি জানো। কিন্তু এই নিরুদ্দেশের মূল কারণ যে আমি তা' নিশ্চয় জানো না। রথীও শোনে নি কোনো দিন।'

ব্রততী ওদিক থেকে অস্ফুট স্বরে বলল, 'শুভ মামা, তুমি কেন মূল কারণ হতে যাবে? কারণ, আমাদের ভাগ্য। ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে।'

'তুই চুপ কর ছোটমাসী। আমাকে বলতে দে।' ওকে থামিয়ে দিল শুভাশিস। তারপর বলতে লাগল, 'বুঝলে বেবী, আমার বাবা আসলে ছিলেন ভাব জগতের মানুষ। মাটীর পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগই ছিল না। ফল যা হবার তাই হয়েছিল! সংসারের সঙ্গে কোনো দিনই তিনি খাপ খাওয়াতে পারেননি। সংসারে থাকতে তাঁর মাথায় এক এক সময় এক এক ভাবনার উদয় হত। আর সেই ভাবনার বেগে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতেন। অন্যেরা তাঁর সেই ভাবনার অংশীদার হতে পারত না। ফলে গণ্ডগোল বেধে যেত। অথচ মানুষটা ছিলেন শিশুর মতন সরল'

শুভাশিস তারপর আরো অনেক কিছু বলে গিয়েছিল, যার সার মর্ম এই রকম।

শুভর মা শুভর দাদুর বৃদ্ধ বয়েসের একমাত্র সন্তান। নিজে মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে কলকাতায় ওই ছোট্ট দোতলা বাড়িটা করেছিলেন। এক মাত্র কন্যা সন্তানকে প্রাণ ধরে কোথাও বিয়ে দিতে পারছিলেন না। তাই অনেক খোঁজা খুঁজি করে ঘর জামাই করে নিয়ে এলেন ইন্দ্রজিত বাবুকে।

ইন্দ্রজিত চাটুজ্যে দেখতে সুপুরুষ, বি. এ. পাশ, অথচ তাঁর তিন কুলে কেউ নেই। এমন যোগাযোগ সহজে হয় না। ভাবনার মধ্যে একটাই ছিল, ম্যাট্রিক পাশের পর কিছু দিন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে ছিলেন। তারপর অবশ্য সন্ন্যাস-টন্ন্যাসের কোনো চিন্তা মাথায় ছিল না তাঁর। সামান্য একটা চাকরি নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই হয়ে দিব্যি ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে দুটো অঘটন ঘটে গেল। প্রথমে শ্বাশুড়ি পরে শ্বশুর মারা গেলেন। ইতি মধ্যে পুত্র শুভ জন্মেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, শুভকে অনেক বড় করে মানুষ করতে হবে। বিলেত পাঠাতে হবে তাকে। কাজেই অনেক টাকা চাই তাঁর। অনেক টাকা রোজগার করা প্রয়োজন। অতএব

সামান্য চাকরিতে আর চলবে না, ব্যবসা করতে হবে। কাউকে কিছু না বলে হুম করে চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। দুর্যোগের সেই হল সূত্রপাত।

কিন্তু ব্যবসা করতে চাইলেই ব্যবসা হয় না। তার জন্য যেমন আর্থিক পুঁজি চাই, তেমনি চাই মজুত অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি চাই বাস্তব বুদ্ধি। ইন্দ্রজিতবাবুর কোনোটাই ছিল না। কাজেই ব্যবসায় নেমে তিনি কেবলই পিছু হঠতে লাগলেন। পিছু হঠতে হঠতে একেবারে দেওয়ালে সেঁটে গেলেন। তারপর আর পেছোবার পথ নেই। দেনায় ডুবে গেলেন একেবারে।

অবস্থা বুঝে শুভর মা একটা স্কুলে চাকরি নিলেন। সংসারটা কোনো রকমে তাল সামলে নিল। কিন্তু টাকার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিতবাবু। মজুত টাকা যা কিছু ছিল তা' অনেক দিনই শেষ। এবার হাত পড়ল শুভর মার গয়নায। গয়নার পর প্রশ্ন উঠল বাড়ি বন্ধকের। শুভর মার নামে বাড়ি। কাজেই বাড়িতে হাত দিতে গেলে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না। ইন্দ্রজিতবাবু তাঁর স্ত্রীর ওপর চাপ দিলেন।

শুভাশিস তখন ক্লাস নাইনে পড়ছে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল, ইন্দ্রজিতবাবু পাগলের মত শুভব মাকে কিল চড় মারছেন। মারছেন আর বলছেন, 'বাড়ি তোমাকে লিখে দিতেই হবে।' শুভর মা যন্ত্রণায কাতবাতে কাতরাতে বলছে, 'না, আমি দেব না। ছেলেকে পথের ভিখিরি হতে দেবনা আমি।'

এ কথায় প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন ইন্দ্রজিতবাবু। চিৎকার করে বললেন, 'তুমি একাই ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাব, তাই না? আমি তার কথা ভাবি না? আমি বুঝি তার বাপ নই?'

শুভর মার তখন আর উত্তর করার মতন অবস্থা নেই। গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ মতন শব্দ বেরোচ্ছে। সেই শব্দে শুভর রক্তে মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে ছুটে গিয়ে সজোরে ইন্দ্রজিত

বাবুর চোয়ালে একটা ঘুষি মারল। আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন ইন্দ্রজিতবাবু। মাটীতে পড়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন পুত্রের দিকে। অনেকক্ষণ আর চোখ সরাতে পারলেন না। যেন এই প্রথম তিনি তাঁর ছেলেকে দেখছেন। শুভর দিকে দৃষ্টি রেখেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, 'তুই এত বড় হয়ে গেছিস শুভ? আমার আয়ের অপেক্ষায় তো রইলি না তুই। সত্যিই তো, কে কার অপেক্ষায় থাকে? আমি ভুল করেছিলাম, ভয়ঙ্কর ভুল।' বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, 'তুই আমাকে মুক্তি দিলি শুভ।'

এই পর্যন্ত বলে শুভ থামল।

'তারপর?' কেমন ভিজে ভিজে গলায় প্রশ্ন করল বেবী।

অদেখা সেই ভাব জগতের মানুষটির জন্য আমার মনটাও তখন ভিজে ভিজে হয়ে উঠেছে। ব্রততীর মুখে কোনো কথা নেই।

শুভাশিস বলল, 'তারপর আর কী? একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। অনেক খোঁজা খুঁজি করা হল। থানা-পুলিস-টুলিশও হল। কোথাও পাওয়া গেল না তাঁকে।' বলে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শুভাশিস।

ব্রততী হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'আর না, এবার ওঠা যাক।'

শুভাশিসের উঠবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। তবু অনিচ্ছা সত্বেও উঠে দাঁড়াল সে।

ব্রততী আগে আগে চলল। আমি মাঝে। শুভাশিস এবং বেবী পেছনে। সবাই চুপ চাপ হাঁটছিলাম। কেমন এক থমথমে ভাব ঘিরে ধরেছিল সবাইকে।

হাঁটতে হাঁটতে বেবী এক সময় বলল, 'ওপর থেকে দেখে আমরা কার আর কতটুক বুঝতে পারি শুভ। এমন তো কত মানুষ আছে যার পাশে পাশে থেকেও তার অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার এতটুকু খোঁজ রাখি না? অনেক কাছের মানুষ হয়েও অনেক দূরের মানুষ থেকে

যায় তারা। আসলে সবুজ মেহেদী পাতার নাচে কত খুন যে লুকিয়ে থাকে কে তার হিসেব রাখে শুভ ?'

শুভাশিস বেবীর কথার কোনো উত্তর দিল না। আমার কিন্তু মনে হল, বেবী যেন কতগুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংগত কথা বলছে। কথাটা মনে হলেও কিছু আর বললাম না। চুপ করেই রইলাম।

বেবী সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আমার কথাই ধরো। এই যে আমি, আমাকে তো তোমরা এত দিন দেখছো। কিন্তু আমাকে দেখে তোমাদের কী কখনো অন্য রকম কিছু মনে হয়েছে ?'

'অন্য রকম মানে ?' শুভর গলায় স্পষ্ট কৌতূহল

'মানে ? মানে, আমার মাথায় একটা খুনের ভাবনা যে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা কী তোমরা কখনো ধরতে পেরেছো ?'

বেবীর এই কথায় যতটা চমকে উঠলাম, একটা বোমা ফাটলেও বোধ হয় এতটা চমকে উঠতাম না। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্রততীর কানেও গিয়েছিল কথাটা। সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাই। শুভাশিসও একটা গোঁত্তা খাওয়ার মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেবীর একটা হাত ধরে বলল, 'এসব ঠাট্টার কোনো মানে হয় না বেবী।'

'ঠাট্টা ? কে বলল এটা ঠাট্টা ?' বেবীর গলার স্বরে কৃত্রিমতার কোনো ছোঁয়া নেই। অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ঋজু তার স্বর।

কিন্তু কথাটা বলেই আমাদের দিকে চোখ পড়ল ওর। একটু যেন সঙ্কুচিত হল। পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে বলল, 'আরে এই দ্যাখো। তোমরাও আমার কথাটাকে সত্যি বলে ধরে নিলে নাকি ? সবাই থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়লে যে। আরে আমি আসলে বলছিলাম অন্য কথা। আমাদের বাড়িতে দেড়শো বছরের পুরোনো একটা পুঁথি আছে। সেই পুঁথিতে এমন সব ঘটনা আছে যা খুনেরই সামিল। আমি সেই কথাটাই ঘুরিয়ে

বলছিলাম। আর তোমরা ভাবলে—।'

কথাটা শেষ না করেই শব্দ করে হেসে উঠল বেবী। কিন্তু তার হাসিতে এতটুকু প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া গেল না। কেমন প্রাণ হীন, কেঠো কেঠো হাসি। স্পষ্টই বোঝা গেল, নকল হাসি দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করল সে।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, বেবীর কী এমন যন্ত্রণা যার জন্যে সে কাউকে খুনের কথা ভাবে? সম্ভব অসম্ভবের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। তবু তো এমনি একটা সাংঘাতিক চিন্তা সে মাথায় রাখছে। কিন্তু কেন? কে-ই বা তার এই ভীষণ যন্ত্রণার কারণ? কিছুক্ষণের জন্যে মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

শুভাশিস কিন্তু এদিকটা নিয়ে আর কোনো কথা বলল না। সে পুঁথির কথা তুলল। বলল, 'দেড়শো বছরের পুরোনো পুঁথি? বলো কী?'

'হ্যাঁ, ওই রকমই হবে। মানে সেই সরফরাজ খাঁর আমলের আর কী!' বেবী বেশ শান্ত গলায় বলল।

'তাহলে তো পড়তে হয় পুঁথিটা।' শুভাশিসের গলায় উৎসাহের আভাস।

'বেশ পোড়ো।' নিরুত্তাপ গলায় বলল বেবী। বেবীর কথার পিঠে পিঠে আমি এবার বললাম, 'কিন্তু দেড়শো বছরের পুরোনো পুঁথি তোমাদের কাছে এল কী করে?'

'নিশ্চয় কোনো যোগসূত্র আছে। পড়লেই তা টের পাবে।' সামান্য হেঁয়ালির সঙ্গে কথাটা বলল বেবী।

আবহাওয়াটাকে সহজ করে দেবার জন্য ব্রততী এবার আমাদের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাল্কা গলায় বলে উঠল, 'এ্যাই। এ্যাই সব ছেলে মেয়েরা, বেড়াতে এসে এসব হচ্ছেটা কী? এ্যাঁ? কেবল ভারি ভারি আলোচনা। এমন মিহি জ্যোৎস্না, এমন মন-উদাস করা বাতাস, আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের উদার আমন্ত্রণ। এসব

নিয়ে কোথায় কাব্য-টাব্য করবে, তা নয়, কার কোথায় দুঃখ আছে তাই নিয়ে হা-হুতাশ। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমাদের দলে নেই। আমি একাই গান ধরলাম।' বলে ব্রততী সত্যি সত্যি গান ধরল—"আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে

কোনো এক অলৌকিক ক্রিয়ায় আমাদের সকলের মানসিক অবস্থা যেন বদলে গেল। প্রথমে বেবী, তারপর আমি এবং শুভ ওর সঙ্গে গলা মেলালাম, "বসন্তেরই মাতাল সমীরণে—।"

গানের সুরে সুর মিলিয়েই বেবী এক সময় বলে উঠল, 'এরই জন্যে ব্রততী আমার প্রাণের বন্ধু।'

দীঘা থেকে সোজা বাড়ি না গিয়ে চৌরঙ্গী হয়ে ফিরছিলাম আমরা। তখন বিকেল পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় লেপটে আছে। রাস্তার ওপর গাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া সটান পড়ে আছে। আমরা তখন দীঘার গল্পে মশগুল হয়ে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি। আশপাশে তেমন দৃষ্টি নেই কারো। হঠাৎ একটা ডাক শোনা গেল, 'বেবী' 'এই বেবী।' মেয়েলি গলার ডাক।

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে এক মোটাসোটা বয়স্কা ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা যে এক সময় রীতিমত সুন্দরী ছিলেন তার প্রমাণ এখনো তাঁর দেহে স্পষ্ট।

আমি আর শুভ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রততী ভদ্রমহিলাকে দেখে কলকলিয়ে উঠল, 'মাসীমা আপনি?'

এক গাল হেসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমরা দীঘা থেকে এই মাত্র ফিরছো? বাড়ি যাওনি এখনো?'

'বাস-টাসের গণ্ডগোল তো। তাই এদিক দিয়ে এলাম।' কথাটা সত্যিও নয়, আবার মিথ্যেও নয়। সত্যি-মিথ্যের মাঝামাঝি।

আমি কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি ভদ্রমহিলা কে। তবে

মনে হচ্ছিল, বেবীর মা-ই হবেন। উনি এবার আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এদের একজন বুঝি তোমার দিদির ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলে ব্রততী আমাদের সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের মাসীমা। অর্থাৎ বেবীর মা। আর এরা হল—।'

আত্মীয়তার ব্যাপারটা দেখে আমার বেশ মজা লাগল। ব্রততীর দিদি হল বেবীর দিদি। আর বেবীর মা হল ব্রততীর মাসীমা এবং আমাদেরও মাসীমা। মনে মনে ভাবলাম, এ এক রকম মন্দ না। যেখানে যেমন সুবিধে।

'হ্যাঁরে, বেবী ওদের এক দিন নিয়ে আয় না আমাদের বাড়িতে। বেশ গল্প গুজব করে সময় কাটানো যাবে।' বেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন বেবীর মা। বেবী ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ, মাসীমা, নিশ্চয় এক দিন যাব।'

বেবীর মা হাসি মুখে সামনে পা বাড়ালেন। দেখা গেল, অদূরে এক ভদ্রলোক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সিগারেট টানছেন। দশাসই চেহারার মানুষ। গায়ের রঙ লালচে বাদামী। সুন্দর করে ছাঁটা মস্ত গোঁফ। পরনে খাঁটি সাহেবী পোষাক। হঠাৎ দেখলে বাঙালী বলে মনেই হয় না।

বেবীর মা ভদ্রলোকের পাশে যেতেই ভদ্রলোক সামনে পা বাড়ালেন।

ব্রততী সেদিকে তাকিয়ে বেবীকে বলল, 'আরে তোর বাবাও সঙ্গে আছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ। বোধহয় কোনো কাজেটাজে যাচ্ছে।' বেবী নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল।

সারা দিন পর বেশ ক্লান্তি লাগছিল। মনে মনে বাড়ির কথা ভাবছিলাম তাই। বাস-ট্রাম যা হোক একটা কিছু ধরে বাড়ি

ফেরা যাক, কথাটা সবে বলতে যাচ্ছি। এমন সময় দেখি, একটা জম-জমাট মিছিল চৌরঙ্গী রোড ধরে ময়দানের দিকে এগোচ্ছে। মনে মনে বললাম, 'যাঃ, হয়ে গেল বাড়ি যাওয়া।'

মুহূর্তে চৌরঙ্গী রোডটা মানুষে মানুষে ছেয়ে গেল। শ্লোগানে-শ্লোগানে ভরে গেল চারদিক। কয়েকটা শ্লোগান যেন আছড়ে পড়তে লাগল কানের ওপর।—লড়াই লড়াই লড়াই চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই। আবার, এ-লড়াই বাঁচার লড়াই। এ লড়াই জিততে হবে।

কাদের মিছিল, কিসের মিছিল, কিছুই জানি না। কী নিয়ে লড়াই তা-ও অজানা। তবু লড়াই শব্দটা মনটায় যেন ধাক্কা দিল।

বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। লড়াই করে বাঁচতে হবে।

শুভাশিস কতকটা বিড় বিড় করে বলল, 'স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স। আবহমান কাল ধরে চলছে বাঁচার লড়াই। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, ভেতরে এবং বাইরে।'

'ভেতরে এবং বাইরে মানে?' শুভর কথার পিঠে পিঠে বলল, বেবী।

'মানে?' শুভাশিস সামান্য সময় চুপ করে বলল, 'মানে, লড়াই তু'রকমের। প্রথম লড়াই নিজের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় লড়াই বাইরের পরিবেশের বিরুদ্ধে। নিজের মনকে একটা কাজের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে যে-লড়াই চলে সেটাই প্রথম লড়াই। নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে যে বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তা-ই দ্বিতীয় লড়াই।'

শুভ কথাটা শেষ করে আমার দিকে তাকাল। আর ঠিক তখনই ঢ্যাঙা মতন একটি ছেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে চিনতে কষ্ট হল না। ছেলেটির নাম পার্থ। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো। ও সায়েন্স নিয়ে বি. এস. সি. পর্যন্ত পড়েছে।

আর আমি এবং শুভ সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নিয়ে পড়েছি। পার্থ চুটিয়ে রাজনীতি করা ছেলে ওর পোশাক পরিচ্ছদে কেমন একটা এলোমেলো ভাব থাকত সব সময় এখনও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না সেই উস্কখুস্ক চুল। মুখে আগের মতই খোঁচা খোঁচা দাড়ি পরনে আধ ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী।

পার্থ আমাদের সামনে হাসি মুখে বলল, 'কিরে কেমন আছিস তোরা? অনেক দিন পরে দেখা'

শুভ তার উত্তর না দিয়ে দুমদাম করে বলে ফেলল, 'হ্যাঁরে, এই মিছিলটা কি তোদের?'

পার্থ চোখ সূক্ষ্ম করে গাবছা ভাবে শুভকে একবার দেখল। সামান্য পিছিয়ে-পড়া ব্রততী এবং বেবীকে দেখল তারপর। খানিকটা সময় নিয়ে ঠোঁটটা ছুঁচলো করে বলল, 'বলতে পারিস মিছিলটা আমাদের। তবে ও-ভাবে বলাটা ঠিক না। এ-ভাবে বললে সমস্ত ব্যাপারটাকেই ছোট করে দেখা হয়। আসলে বলা উচিত এই মিছিল যেমন আমার তেমনি তোর। কারণ, এই মিছিলের ভাষা, সকলের ভাষা এই মিছিল আমার তোর সকলের লড়াই-এর কথা বলছে'

'বাঃ, বাঃ চমৎকার। পাক্কা রাজনীতি করা লোক হয়ে গিয়েছিস দেখছি' শুভ তখনো হাল্কা মেজাজেই কথাটা বলল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়ে উঠল পার্থ। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোর কাছে ঠিক এ-রকম হাল্কা কথা আশা করিনি শুভাশিস। অন্ততঃ এই সব সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে। এটা মানুষের জীবিকার লড়াই। মানুষের বাঁচার লড়াই। সেটা মনে রাখিস।'

'আমি কিন্তু এটাকে খাটো করার জন্যে কথাটা বলিনি।' কুণ্ঠিত ভাবে বলল শুভ।

পার্থ এবার দিল-খোলা হাসি হেসে বলল, 'ঠিক আছে ব্রাদার। মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ইজ মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। কই বাত্‌ নেই।'

একটু থেমে বলল, 'আসলে কী জানিস? জীবনের সূত্রপাত থেকেই লড়াই চলছে। কিন্তু দিনের পর দিন শত্রুর চেহারা বদলাচ্ছে, তার আক্রমণের কায়দাও পাল্টে যাচ্ছে। শত্রু পক্ষ আজ ভীষণ চালাক, দারুণ সেয়ানা। আজ কেউ একক ভাবে তার মোকাবিলা করতে পারে না। চাই ঐক্যবদ্ধ লড়াই। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বললেই তো ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় না। একটা বিশেষ নীতিকে সামনে রেখেই ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। কাজেই নীতিটাকে আগে ঠিক করা চাই।'

'তাহলে যে বললি মিছিলের ভাষাই সকলের ভাষা? এই মিছিলের নীতির সঙ্গে অন্য কারো নীতির মিল নাও তো হতে পারে। তখন?' শুভ সামান্য আক্রমণের চেষ্টা করল।

পার্থ উস্কখুস্ক চুলগুলোকে মাথার পেছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'তাহলে তো মূল কথায় চলে আসতে হয় ভাই। মোদ্দা কথাটি কী? না, আমাদের আজকেব এই সমাজ-ব্যবস্থাটা সাধারণ মানুষকে শোষণের এক বৃহৎ যন্ত্র। সাধারণ মানুষ এখানে প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছে। অথচ সব কিছু জেনেও তার কিছু করার থাকছে না। কাজেই শোষণের এই গোটা কলটাকে বিকল করে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এবং বিকল করবার একমাত্র উপায় জোট বেঁধে লড়াই করা। কাজেই প্রত্যেককে অফিস-কাছারি, মিল-ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক স্তর থেকে জোট বেঁধে লড়াই করতে হবে। লড়াইয়ের সেই হাওয়া পৌঁছে দিতে হবে গ্রামে-গঞ্জে, মাঠে-ময়দানে। আজকের এই মিছিলের ভাষাও তো লড়াই এর সেই ভাবাই ব্রাদার। যাকগে। তুই এবং রথী বরং এক কাজ কর। একদিন চলে আয় আমাদের পার্টি অফিসে। সেখানে আমাদের এবাদত্ হোসেন সাহেব আছেন। থিওরিটিসিয়ান। তাঁর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পাবি। পার্টি মেম্বার হতে বলছি না। সেটা নিজেদের ইচ্ছের ব্যাপার। সিম্পল্ আলোচনার জন্যে বলছি। চলে আয় একদিন।'

শুভ সোৎসাহে রাজী হয়ে গেল। আমি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

পার্থ চলে যেতেই ব্রততী বলল, 'রাজনীতি করা লোকগুলো যেন কেমন। নিজেদের সব বুলি জোর করেই যেন মানুষের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। বকর বকরের ঠ্যালায় অস্থির।'

'লোকগুলো কিন্তু নিজের কথা ভেবে এসব করে না। অন্যের ভালোর জন্যেই এত সব করে বেড়ায়। সেদিকটাও ভেবে দেখিস।' শুভ বেশ আস্তে আস্তে কথা ক'টা বলল।

ব্রততী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কিন্তু এদিকে যে শরীর আর বইছে না, তা' কে দেখছে?'

কথাটা আমাদের সকলেরই মনে ধরল। সত্যি তখন আর শরীর বইছে না। কাজেই সকলে মিলে ট্রাম বাসের দিকে ছুটলাম এবার।

তিন ॥

আজ বেরোবে কাল বেরোবে করতে করতে তুম করে একদিন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। এবং যা আশা করেছিলাম, পরীক্ষার রেজাল্ট প্রায় তা-ই হল। আমি কোনো রকমে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলাম। আর শুভাশিস পেল হাই সেকেণ্ড ক্লাস। আমাদের সাবজেক্টে ফার্স্ট ক্লাস পেল না কেউ। শুভাশিস ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে বেশ খানিকটা আপসেট হয়ে গেল। কলেজের চাকরি পাবে কী পাবে না, এই নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে রইল। আমার কথা ওঠে না। কারণ, আমার যা রেজাল্ট তাতে সোজা পথে কেরানি গিরি ছাড়া অন্য কিছু জুটবার কথা নয়। তবে বেঁকা পথে পিতৃদেব ভরসা। দুঁদে এ্যাডভোকেট তিনি। তাঁর অনেক প্রতাপশালী মক্কেল এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই পথে যে কোনো এক জায়গায় ছোটো খাটো অফিসারের পদে বসিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি। পিতৃদেবের অবশ্য ইচ্ছে ছিল, আমি আইন পড়ি কিন্তু বাবার ইচ্ছে এবং ছেলের ইচ্ছে একেবারে বিপরীতমুখী হওয়ায় এ নিয়ে আর বেশী টানাটানি হয়নি। পিতৃদেব তাঁর অপোগণ্ড ছেলেটিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অতএব আমার নাম একেবারে নীচের দিকে থাকায় আমি একেবারেই বিচলিত হইনি। কিন্তু শুভ সত্যি সত্যি বিচলিত হয়ে পড়ায় আমার খুব খারাপ লাগছিল। তবু সাহস দিয়ে বললাম, 'এতে মন খারাপের কিছু নেই। অনার্সে যখন ফার্স্ট ক্লাস আছে, তখন গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। লেকচারার শিপ কোন ব্যাটা না দেয়, একবার দেখি।'

'কিন্তু কলকাতায় হবার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। হলে বাইরে।' গম্ভীর মুখে বলল শুভ।

'তা ঠিক।' ওর কথায় আমিও একটু দমে যাই।

'ভাবনাটা সেখানেই।' একটু থেমে ঠোঁটটা দু'বার কামড়ে শুভ আবার বলল, 'বাবাকে তো আমিই তাড়িয়েছি। এখন তিনি কোথায় কী ভাবে আছেন জানি না বেঁচে আছেন কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ। এই অবস্থায় প্রথম চাকরি নিয়েই যদি বাইরে গিয়ে কোথাও থাকতে হয়, তাহলে ভদ্রমহিলাব মানসিক অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় একবার ভেবে গ্যাখ।'

কথাটা আমিও ভেবেছি। তবু আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'এ্যাতো ভাবছিস কেন? কলকাতায় তো হয়েও যেতে পারে।'

শুভ এবার পিট পিট করে হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু শিয়াখালার সেই সাধক তো বলেছেন, কলকাতায় আমার চাকবী হবে না। হবে কলকাতা থেকে অনেক উত্তরে। তাঁর ওপর তোদের তো খুব আস্থা।'

'তোর আস্থা নেই?' বললাম আমি।

'কোন প্রমাণ তো পাইনি এখনো। ভরসা করি কী করে?'

'একটা প্রমাণ কিন্তু পেলি। উনি বলেছিলেন, তুই ফাস্ট´ ক্লাস পাবি না। পাবি, হাই সেকেণ্ড ক্লাস। সেটা কিন্তু মিলেছে।'

শুভ উত্তর না দিয়ে পিট পিট করে হাসতেই লাগল।

শুভ যাই বলুক আমার কিন্তু শিয়াখালার সাধককে সত্যি অদ্ভুত মনে হয়েছে। ওখানে গিয়েছিলাম গোটা কয়েক রবিবার আগে। যাওয়ার গরজটা ছিল ব্রততীর। সে কোত্থেকে এই সাধকের খোঁজ পেয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে আমাদের সে-সব কিছু বলেও নি। আমরা ভেবেছিলাম স্রেফ বেড়ানোটাই উদ্দেশ্য। কাজেই ওর এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

আগে হাওড়া ময়দান থেকে হাওড়া-শিয়াখালা ট্রেন ছিল।

আম বাগান, বাঁশঝাড়, নিকোনো উঠোন, পদ্ম পুকুরকে পাশে রেখে ট্রেন ছুটত। কিন্তু এখন তা' নেই। এখন বাসে উঠে ট্যাঙ-ট্যাঙ করে যেতে হয়।

আমরা ভোর-ভোর নাগাদ. বেরিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরের আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম সেখানে। সেই সাধকের আশ্রমটি সুন্দর। গাছ-গাছালিতে ভরা ছায়া ছায়া পরিবেশ। কেমন আমেজ মাখানো। আশ্রমের সামনে মস্ত বট গাছ। গাছের নাচটা সিমেন্ট বাঁধানো। বট গাছের অদূরে কালী মন্দির। মন্দির থেকে খানিকটা দূরে একটা পুকুর। টলটলে তার জল। বাঁধানো ঘাট।

মন্দিরের গায়ে পাশাপাশি দুখানা ঘর। একটা ঘরে দর্শনার্থীদের বসবার ব্যবস্থা। আর একটা ঘরে সাধক তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে থাকেন। এক এক দর্শনার্থী তাঁর ঘরে যায়। তারা প্রশ্ন করে তিনি উত্তর দেন। কখনো প্রশ্ন করার আগেই সব বলে দেন। দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। কোন. ধর্মের বাছ-বিচার নেই সেখানে।

আমাদের অনেক আগেই সেখানে ভিড় জমে গিয়েছিল। ব্রততী বলল, তার প্রশ্ন আছে। কাজেই সে গিয়ে মেয়েদের মধ্যে লাইন দিল। আর আমরা গিয়ে বসলাম বাঁধানো ঘাটে।

গল্পে গল্পে আমাদের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল। এদিকে ব্রততীর ফিরবার নাম নেই। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। আমরা যখন মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি, তখনই ফিরে এল ব্রততী। ওর মুখটা তখন থম থম করছে।

ব্রততী আমাদের সঙ্গে একটা কথাও না বলে তর তর করে নেমে গেল নীচে। তারপর ভালো করে হাতে-পায়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে আমাদের কাছে এসে বসল। বসেই এমন একটা কথা বলল যার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত

ছিলাম না। বলল, 'শুভমামা, জামাইবাবু এখনো বেঁচে আছেন, এবং ভালো আছেন।'

ব্রততী দুম করে একটা বোমা ফাটাল যেন। অমরা সবাই এক সঙ্গে চমকে উঠে বললাম, 'মানে?'

ব্রততী এবার সবটা পরিষ্কার করে বলল, 'সত্যিই অদ্ভুত সাধক। মনের কথা বুঝতে পারেন। আমি ওর সামনে গিয়ে বসতেই উনি বললেন, 'তুই যে আত্মীয়ের জন্যে এসেছিস তিনি তো দিব্বি শান্তিতে আছেন দেখছি। তাঁর জন্যে তোরা বেশী ভাববি না ভাবলে তার কষ্ট হয়। তবে তাঁর সঙ্গে তোদের আবার দেখা হবে।' একটু থেমে ব্রততী আবার বলল, 'আমার মনে জামাইবাবু সম্বন্ধে এই প্রশ্নটাই ছিল। আর হ্যাঁ, শুভ মামা, তোমার কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, তুমি হাই সেকেণ্ড ক্লাস পাবে। চাকরী হবে কলকাতা থেকে অনেক উত্তরে।'

শুভ সামান্য সময় চুপ থেকে বলল, 'মাকে আবার এসব বলিস না যেন।. বাবার কথা শুনলে অস্থির হয়ে উঠবেন।' শুভাশিস আবার বলল, 'তোর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলি না?

'আমার আবার কী কথা? আমাব কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমি কেবল দিদির যা' যা' প্রশ্ন হতে পারে তা-ই করেছি। অন্য কিছু না।' ব্রততী শুভর প্রশ্নের কাটা কাটা উত্তর দিল।

কথায় কথায় আমরা শুভদের বাড়িতে এসে পড়লাম। আমার মাথায় তখনও কিন্তু শিয়াখালার ব্যাপারটা ঘুরছে। বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি, ব্রততী এবং বেবী বসে আছে। সবে ফিরেছে অফিস থেকে। আমরা ঢুকতেই ব্রততী বলল, 'তোমরা এসে গেছ। ভালোই হল। এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।'

শুভ আমাদের আগের আলোচনার জের টেনে বলল, 'বুঝলি রথী, আমার মনে হয়, পাশের এই ভবিষ্যদ্বাণীটা সিম্পল্ কায়েন্সিডেন্স। কাকতালীয় ছাড়া আর কিছু নয়।'

ব্রততী উঠতে গিয়েও উঠল না। বলল, 'তুমি তাহলে এসব বিশ্বাস করোনি?'

'কোনো যুক্তি পাই না যে!' শুভাশিস শান্ত ভাবে বলল।

ব্রততী কিন্তু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'তুমি যে নাস্তিক। সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি খুঁজতে যাও। সেদিন প্রসাদ নিতে গিয়ে বললে খেতে ভালো লাগে খাই, কিন্তু এ-সবের কোনো মানে নেই। সত্যি শুভ মামা, আমি অবাক হয়ে ভাবি এতটা অধার্মিক তুমি হলে কী করে।'

'ব্যস। অমনি ধর্মকে টেনে আনলি তো? যত্ত সব।'

ব্রততী আর কোন কথা বলল না। চা আনতে উঠে গেল।

ব্রততী চলে যেতেই বেবী বলল, 'আচ্ছা শুভ, সত্যি সত্যিই কি তুমি ধর্ম-টর্ম মানো না?'

'না।'

'কেন মানো না?'

'ধর্ম মানুষে-মানুষে অবাধ মেলা মেশার প্রতিবন্ধক বলে!'

'তাহলে কী বলতে চাও, কোরাণ-বাইবেল-গীতা, এসব অর্থহীন?'

শুভাশিস বলল, 'এর উত্তর আমার নিজের কথায় হবে না। কবির কথায় এর উত্তর দিতে হবে। শোনো—

"কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও, যত সখ—"

বেবীর দিকে তর্জনী তুলে তারপর বলতে লাগল—

"তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সেথা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।"

বেবী এবার বলল, 'ছাখো, কোটেশান তুলে পুরোপুরি নিজের

কথা বলা যায় না। হয়তো খানিকটা বলা যায়। আমি তোমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করছি।'

'করো।'

'তুমি নিজে কি ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারবে?'

'কি রকম প্রমাণ চাই?' বেবীর দিকে সামান্য ঝুঁকে প্রশ্ন করল শুভাশিস।

'প্রমাণ চাই না। উত্তর চাই।' বেবী ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'কথা দিয়ে সত্যি কারের উত্তর হয় না। কাজের মধ্যে দিয়ে এ সবের উত্তর দিতে হয়। বাস্তব জীবনে তেমন প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে নিশ্চয়ই কাজের মধ্যে দিয়ে এর উত্তর দেব।'

'তবু মনের কথা জিজ্ঞাসা করছি। মন কি প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত।' বেশ গমগমে গলায় উত্তর দিল শুভ।

এমন সময় ব্রততী ঢুকল চা নিয়ে। শুভর শেষ কথাটা শুনে বলল, 'কীসের প্রস্তুতি?'

'বলছিলাম, আমি যে, ধর্ম মানি না তার প্রমাণ হিসাবে যে কোন ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী। সে মুসলমান-খ্রীষ্টান-ইহুদি যে কোন ধর্মের হোক।'

কথাটা শুনে ব্রততী যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল। গোল গোল চোখে শুভাশিসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তুমি কি পাগল হলে? অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার জাত-ধর্ম যাবে না?'

'যে ধর্ম মানে না, তার জাত-ধর্ম গেলেই বা কি?'

শুভ যে কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করে যাচ্ছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এই আলোচনার অন্য একটা দিকও যে আছে, সেটা ভেবে মনে মনে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'শুভ, এ সব আলোচনা এবার বন্ধ কর তো।'

কিন্তু ততক্ষণে যা অঘটন ঘটবার ঘটে গিয়েছিল। ভেতরে শুভর মার কানে চলে গিয়েছিল, শুভ এবং ব্রততীর শেষের আলোচনা। তিনি ভেতর থেকে ছুটে এসেছিলেন তাই।

ঘরে যখন শুভর মা ঢুকলেন, তখন তার মুখ থম থম করছে। তিনি শুভর দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, 'আমি জানতাম, এমনি কিছু একটা হবে। কিন্তু শুভ এই ভয়ঙ্কর খেলায় তুই মাতিস না। এরকম কিছু একটা করবার আগে তুই আমাকে খুন করে ফেলিস।'

'মা তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।'

'মিথ্যে কী সত্যি বুঝি না আমি। তুই আমাকে কথা দে শুভ। কথা দে।'

সেদিন সেই মুহূর্তে হঠাৎ যদি মাথার ওপর ছাদটা ভেঙে পড়তো, তাহলেও বোধ হয় আমরা এতটা বিচলিত হতাম না। শুভর মার কথার পর আমাদের কারো মুখে কোন কথা সরেনি আর।

ওদের বাড়ি থেকে চলে আসবার মুহূর্তে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল, মানুষের যাচাই হবে কী দিয়ে? জাত-ধর্ম-সংস্কার দিয়ে না ভালোবাসা দিয়ে?

জানতাম, বেবী খুবই আহত হয়েছে। কিন্তু বাইরে সে তেমন কিছুই প্রকাশ করল না। এমন একটা ভাব দেখাল যেন কিছুই হয় নি। সমস্ত ব্যাপারটাকেই বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করল সে। কিন্তু সহজ হতে পারল না ব্রততী। সেদিন থেকে আমাদের কাছ থেকে সে এক রকম দূরেই সরে গেল। আমাদের কাছ থেকে বললে অবশ্য ভুল বলা হয়। ঠিক করে বলতে হলে বলতে হয়, সরে গেল বেবীর কাছ থেকে। বেবীকে মনে মনে সে ত্যাগই করল যেন।

ব্রততীর ব্যবহারে বেবী যে কতখানি আঘাত পেয়েছিল। তা' বুঝেছিলাম অনেক দিন পর। তবে সেদিন থেকেই বেবী আমার কাছে কেবল রোশেনারা হয়েগিয়েছিল। আর বেবীর কাছে আমি কবি।

॥ চার ॥

বাবার মক্কেলদের তদ্বিরে সত্যি সত্যি আমার একটা চাকরি হয়ে গেল। চাকরিটা যেমন ওজনের ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে একটু বেশী ওজনেরই হল যেন। মুরুব্বি থাকলে যেমন হয় আর কী। আমার চাকরির জন্যে শুভর চাকরিটাও আটকে ছিল যেন। আমার চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তারও একটা চাকরি হয়ে গেল। তবে বাইরে। বহরমপুরে একটা কলেজে লেকচারারশিপ পেল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের সকলের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরী হয়ে গেল। অবশ্য আমার সঙ্গে বেবী এবং ব্রততী উভয়ের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হত। তবে বেশীর ভাগই দেখা হত পৃথক পৃথক ভাবে।

বেবীর সঙ্গে কথা-বার্তা হত কোন পার্কে বা রেস্টুরেণ্টে বসে। ছুটির পর কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে যে যার মতন চলে যেতাম। আর ব্রততীর সঙ্গে দেখা করতে হলে যেতে হত ওদের বাড়িতে।

সেদিন বেবী অফিসে ফোন করল। বলল, 'ছুটির পর সোজা কার্জন পার্কে চলে এসো। কথা আছে।'

কার্জন পার্কে আমরা দুজনে মুখোমুখি হতেই বেবী বলল, 'তুমি যে আমাদের পুরোনো পুঁথিটা পড়তে চেয়েছিলে পড়লে না-তো? আজ যদি কাজ না থাকে আমাদের বাড়ি চলো।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম আমি।

ওদের বাড়ী সেই আমার প্রথম যাওয়া। ছোট্ট দোতালা বাড়িটা বেশ সুন্দর। কলিং বেল টিপতেই ঝি এসে দরজা খুলে দিল। বাড়িতে ঢুকতেই মনে পড়ল ওর মার কথা। ওর মা সেদিন

বলেছিলেন, আমাকে ওঁর ছেলে বেলার লেখা কবিতা শোনাবেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম রোশেনারাকে, 'তোমার মা নিশ্চয় বাড়িতেই আছেন?'

—না। মা-বাবা কদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে গেছেন।

—বাড়িতে তুমি তাহলে একা?

—ঠিক একা নয়। নানীমা আর ঐ ঝি আমিনা আছে।

—নানী? তোমার নানী আছেন নাকি?

'হুঁ। মার দূর সম্পর্কের মাসী। খুব ভালো মানুষ। প্রায় সব সময়ই কোরাণ পড়েন। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে চলো ওপরে আমার ঘরে বসবে।'

দোতালায় একটা ঘর রোশেনারার নিজস্ব। রাস্তার ধারেই ঘরটা। রাস্তার ওপারে খানিকটা দূরে একটা পার্ক। ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে মিষ্টি হাওয়া আসছিল। ঘরে ঢুকতেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

ঘরটিও ছিমছাম করে সাজানো। আসবাবপত্র খুব বেশী কিছু নেই। একটা বড় আকারের বুক-শেলফ বই-এ ঠাসা। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। মাঝারি গোছের একটা আলমারি। পুরোনো। একটা সিঙ্গল বেডের খাট। দেওয়ালে একটা মাত্র বাঁধানো ফটো ছাড়া ঘরে আর কোন ছবি নেই। একটা ক্যালেণ্ডারও না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটোটা দেখলাম। বছর চল্লিশ বয়েসের একজন শিকারীর ফটো। শিকারীর পায়ের কাছে একটা মরা বাঘ, হাতে বন্দুক। দেখলেই বোঝা যায়, বাঘটা মারার পরেই ফটোটা তোলা। রোশেনারার দিকে চেয়ে বললাম, 'কে ইনি?'

আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। একটু-কাল চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'আমাদের একজন নিকট আত্মীয়। আজ আর ইনি নেই। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। একদিন এঁর কথা সব বলবো।' একটু থেমে বলল, 'তুমি

একটু বসো। চা-টা না খেয়ে কোন কিছুই হবে না। চায়ের ব্যবস্থাটা আগে একটু দেখি।'

রোশেনারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি একখানা একখানা করে বুক-শেলফে রাখা বইগুলো উল্টে উল্টে দেখতে লাগলাম। নানা বিষয়ের ওপর বই। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস। দেখে মনে হয়, অনেক দিনের সঞ্চয়। বইগুলো নাড়াচাড়া করতেও ভালো লাগলো। সেই সঙ্গে ভালো লাগলো রোশেনারাকে। এত সব বই-এর কিছু অন্ততঃ পড়েছে। এই সব বই-এর কিছু পড়লেও যে অনেক পড়া। শেকস্‌পীয়ারের একটা ভলিয়ুম পেয়ে গেলাম হাতের কাছে। সেটা নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে একটা ছোট কাগজের টুকরোতে চোখটা আটকে গেল। কাগজের টুকরোটায় লেখা হ্যামলেটের কয়েকটা লাইন—

> "To be or not to be, that is the question.
> Whether 't is nobler in the mind, to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms against a sea of troubles,
> And by opposing end them ?"

লাল কালির একটা মোটা রেখা টেনে সমস্ত লেখাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এই লাইনগুলোর নীচেই বাংলায় লেখা—

"কী ভীষণ জ্বালায় যে মনটা জ্বলছে সারাক্ষণ! কিন্তু পারছি না, কিছুতেই এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারছি না! অপরাধীর সমস্ত অপরাধ জেনেও চুপ করে থাকতে হচ্ছে! একী দুর্বলতা! হ্যামলেটের বুকের জ্বালা যেন আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। বড় ভয়ঙ্কর সে উপলব্ধি!"

কাগজটার কোথাও সন তারিখ নেই, সইও নেই কারও। বইটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ, লেখাটা কার হতে পারে! রোশেনারার? কিন্তু রোশেনারার হাতের

লেখা তো আমি চিনি। এ হাতের লেখা তো ওর নয়। তবে কার? কে সেই ব্যক্তি যার বুকে এত জ্বালা! কে সেই ব্যক্তি যে অপরাধীর সব অপরাধ জেনেও তাকে শাস্তি না দিয়ে নিজেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে? হ্যামলেটের মানসিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে নিজের মনের দ্বন্দ্বকে এক করে দেখতে চাইছে? কে এই ব্যক্তি?

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই একটু চমকে উঠলাম। হঠাৎ নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল। কারও কোন মূল্যবান জিনিষ যেন না বলে নিয়েছি,—এমনি একটা মনের ভাব। কতকটা অপরাধীর মতই বুক-শেলফটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। বইটা বন্ধ করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, পাছে কাগজটা ওর নজরে পড়ে।

—বই রেখে এবার এসো। আগে একটু খেয়ে নাও।

ট্রেতে সাজিয়ে দু'ডিশ মাংস আর দু'ডিশ পরোটা নিয়ে ঘরে ঢুকল রোশেনারা। পেছনে দু'বাটি সিমায়ের পায়েস নিয়ে আমিনা। তখনও আমি তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে। রোশেনারার কথাটা যেন কানেই ঢোকেনি আমার। টেবিলের ওপর খাবারের ডিশগুলো সাজাতে সাজাতে আবার বলল, 'কই হে কবি, আগে এদিকে এসো। পেটে কিছু দানাপানি আগে দিয়ে নাও।'

—কিন্তু এত খাবার কি হবে?

নিজেকে সহজ করে নিয়ে বইটা যথাস্থানে রেখে বললাম আমি।

—কি আর হবে, আমরা খাব।

—তাই বলে এত!

—কি আর এমন!

টেবিল থেকে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'খেতে শুরু করলে দেখবে এ কিছু না।'

টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি খেতে বসে বললাম, 'তা' এত সব করলে কখন ?'

—আমি তো কিছুই করিনি। সব কিছু করেছে আমিনা। তাছাড়া আগেই সব করা ছিল। এখন শুধু একটু গরম করে দেওয়া। মানে তোমার জন্যে স্পেশাল করে কিছুই করা হয় নি। অতএব—

—অতএব ?

ওর মুখের দিকে চাইলাম আমি।

—অতএব কোনো সঙ্কোচ না করে ভাল ছেলের মত সবটা খেয়ে নাও।

আমার চোখে চোখ রেখে হাসল রোশেনারা। আমিও হাসলাম।

খাওয়ার পাট চুকলে আমিনা এসে টেবিলটা পরিষ্কার করে দিল। রোশেনারা এবার আলমারি থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স বার করে আনল। বাক্সটার গায়ে সুন্দর খোদাই করা কাজ।

টেবিলের ওপর বাক্সটা রাখতে রাখতে রোশেনারা বলল, 'বাক্সটার বয়েস যে কত তা' ঠিক বলতে পারব না। তবে খুবই পুরোনো, দেড়শো-দুশো বছরেরও হতে পারে। আমাদের বংশের কে যে কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন জানি না। শুনেছি কোনো এক ফকিরের কাছ থেকে এটা পাওয়া।'

বাক্সটা খুলতেই ন্যাপথলিনের গন্ধে ভুর ভুর করতে লাগল। ভেতর থেকে লাল খেরোতে বাঁধানো একটা খাতা আলগোছে বার করল রোশেনারা। একটা লাল রঙের দড়ি দিয়ে বাঁধা খাতাখানা। রোশেনারা সন্তর্পণে বাঁধনটা খুলে ফেলল, খুলে আমার সামনে এগিয়ে দিল খাতাটা।

তুলট'কাগজের ওপর ভুয়ো কালিতে লেখা পুঁথি। 'পুঁথিটা হাতে নিতেই কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত শরীর

দুলে উঠল। কত যুগ আগে একটা মানুষ আপন খেয়ালে দিনের পর দিন বসে পাতার পর পাতা লিখেছিলেন। এতকাল পরে সেই পাতাগুলো আমার হাতে এসে পৌঁছল। কথাটা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগল।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই চোখে পড়ল, কয়েকটা পাতা পোকায় কাটা। খব খারাপ লাগল। মনে হল, পোকার কামড় আসলে সেই মানুষটির গায়েই লেগেছে। যাদের হাতে এর যত্নের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের অবহেলায় যেন সেই মানুষটির দু' চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছে। পোকা-খাওয়া পাতাগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'এমন ভাবে পোকায় কেটে দিয়েছে ?'

—হুঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোশেনারা। তারপর বলল, 'একটা সময় পুঁথিটাকে প্রায় ফেলেই দেওয়া হয়েছিল। আমার ঠাকুর্দা যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, নইলে এটুকুও হয়তো থাকত না। অথচ দ্যাখো, এটা যে শুধু আমাদের বংশের ইতিহাস তাই নয়, এটা বাংলা দেশেরও ইতিহাস। কেবল তাই নয়, এই পুঁথিটা বাঙালীর জীবনের একটা বিশেষ দিককে মেলে ধরতে সাহায্য করে।'

পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। খুব সন্তর্পণে পাতা ওল্টাতে হয়, নইলে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা। লম্বা লম্বা মোটা মোটা অক্ষর। গোটা পুঁথিটাই পদ্যে লেখা। দু'একটা পাতা ওল্টাতেই একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল। পয়ার ছন্দে কবি লিখেছেন—

বিষ্ণুপদ পিতা তাঁর রাধানাথ নাম।
মুখ্য বংশ জাত তেঁই জেমোকান্দি গ্রাম॥
কুলীনের শিরোমণি জ্ঞানে বৃহস্পতি।
দান ধ্যান পূজা পাঠ ধর্মে সদা মতি॥

চঞ্চলা কমলা তাঁর বাঁধা থাকে ঘরে।
দুঃখী গেলে তাঁর ঠাঁই বিমুখ না করে॥

এইটুকু পড়েই রোশেনারার মুখের দিকে চাইলাম। রোশেনারা আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। আমি চাইতেই হাসল।

—কেমন লাগছে? হেসেই প্রশ্ন করল আমায়।

—ভাল। সত্যি কথা বলতে কী, এতটা ভাল আমি আশা করিনি।

—সবটা না পড়ে কিন্তু বেশী প্রশংসা করা ঠিক হচ্ছে না।

—তা বটে। হেসেই বলল রোশেনারা।

ছোট করে উত্তর দিলাম আমি।

কথা বলতে বলতে আর একটা জায়গায় নজর পড়ল। সেখানে নবাব সরফরাজ খাঁর চরিত্র এবং তাঁর আমলের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কবি লিখেছেন—

সুজা পুত্র সরফরাজ চণ্ড ভীষণ।
কত ভাবে করে নিত্য হিন্দু নিপীড়ন॥
বাকী খাজনা থাকে যার বৈকুণ্ঠে বাস।
গো মাংস দিয়া কারো করে সর্ব্বনাশ॥

—ক'টা মাত্র লাইনে এ-যে এক সাংঘাতিক চিত্র। রোশেনারার দিকে চেয়ে কথাটা বললাম আমি।

—হুঁ।

—আচ্ছা একটা কথা।

—কি?

—এটা যাঁর লেখা তিনি তো তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—অথচ কী আশ্চর্য ছাখো, লেখাটায় কেমন হিন্দুয়ানীর ছাপ। মনে হচ্ছে যেন তিনি হিন্দুই ছিলেন।

রোশেনারা আমার কথার কোন উত্তর দিল না। কেবল একটু হাসল।

গোড়া থেকেই পড়তে শুরু করলাম এবার। একটু জোরেই পড়ছিলাম যাতে আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে রস গ্রহণ করতে পারি। পড়তে পড়তে কখন এক সময় হারিয়ে গিয়েছিলাম ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে। ইতিহাসের ঘটনাগুলো আমাদের কাছে বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। বর্তমান গিয়েছিল হারিয়ে। এক অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসেছিল আমাকে। মনে হচ্ছিল, আমাব আর রোশেনারার নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই, আমরা যেন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। অনন্ত কাল ধরে যেন আমরা বসে আছি, আর অনাদিকালের স্রোত বয়ে চলেছে আমাদের সামনে দিয়ে।

মুর্শিদাবাদের নবাব আমলের কাহিনী। সেটা ছিল নবাব সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁর আমল। নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ। পাকা বাড়ি, বড় বড় রাস্তা, থরে থরে সাজান দোকান-পাট, মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি হাট-বাজার। আতরের খুশবুতে আমোদিত চারধার। শহরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে প্রশস্ত ভাগীরথী। তার বুকে বড় বড় নৌকো, বজরার আনাগোনা। ছন্দে ছন্দে শহরের নিখুঁত বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি এর অতীত দিনের কথাও বলেছেন। এই শহরের এমন গৌরবের দিন চিরকাল ছিল না। আজ যেখানে শহর একদিন সেখানে ছিল গভীর জঙ্গল, দু'চারখানা কুঁড়ে, আর খাঁ খাঁ মাঠ। এর রূপ বদলের মূলে মুর্শিদকুলি খাঁ। মুর্শিদকুলি খাঁর নিজের জীবনের মতই যেন মুর্শিদাবাদের পরিবর্তন। কোথা থেকে কোথায়।

দক্ষিণ ভারতের এক গরীব ব্রাহ্মণের অনাথ। বাড়ি নেই, ঘর নেই। বলতে গেলে পথই অবলম্বন। ইস্পাহানের হাজী সফি এই অনাথ ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে নিলেন কিনে। নাম রাখলেন মির্জা হাদী। 'হাজী সফির মৃত্যুর পর জীবনের নানা পথ 'পরিক্রমা

করে ঘুরতে ঘুরতে মির্জা হাদী একদিন চাকরি পেয়ে গেল খোদ বাদশা আওরঙ্গজেবের দরবারে। দিন যায়। মির্জার কাজে খুশি হলেন বাদশা। খুশি হয়ে তাকে সুবে বাংলার দেওয়ান করে পাঠালেন। সেই সঙ্গে নতুন উপাধি দিলেন করতলব খাঁ। সূচনা হল নতুন যুগের। নতুন করে জমি জরিপের আদেশ দিলেন করতলব খাঁ। কাজের সুবিধের জন্য ঢাকা থেকে দেওয়ানখানা সরিয়ে নিয়ে এলেন সুবার মধ্যস্থলে, মুকসাদাবাদের কুড়ুলিয়া মৌজায়। বন জঙ্গল কেটে নগর বসল। প্রাসাদ উঠল। কেল্লা তৈরী হল। শুরু হল এলাহি ব্যাপার। বাদশার কাছ থেকে নবাবী খেতাব পেলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বিরাট পদবী হল তাঁর,—মুতামিন-উল-মুলক্-আলাউদ্দৌলা জাফর খান নাসিবি জঙ মুর্শিদকুলি খাঁ।

কেবল নবাবী খেতাব পেয়েই চুপ করে বসে থাকেন নি। অনেক কিছু করেছেন তিনি। মগ, হর্মাদ, বোম্বেটের ভয় দূর করেছেন। প্রজারা যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে আবার নবাবের ঐশ্বর্য যাতে বৃদ্ধি পায় তারও ব্যবস্থা করেছেন। রাজস্বের বাকী-বকেয়া মিটিয়ে দেবার জন্য বছরের শেষ দিন নির্ধারিত করলেন। এই দিনে সব কিছু মিটিয়ে দিতেই হবে। ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে উঠল নবাব প্রসাদ।

কাজের মধ্যেই দিন ফুরিয়ে এল নবাবের। বৃদ্ধ নবাবের পেয়ারের নাতি সরফরাজ খাঁ। নবাবের ইচ্ছে ছিল, তাঁর পর তাঁর নাতিই মসনদে বসেন। কিন্তু তা হল না। বাদশার ফরমান এল জামাতা সুজাউদ্দিনের নামে। পিতার নামে ফরমান আসায় ক্রুদ্ধ হলেন বিলাসী পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত করলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন সুজাউদ্দিন। কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করতে হয়নি তাঁকে। অল্প দিনেই সময় ঘনিয়ে

আসে তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন সরফরাজ খাঁ।। যেমন বিলাসী তেমনি প্রচণ্ড বদ মেজাজী। ক্ষমা করতে শেখেন নি। কারও সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। প্রজারা তাঁর ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত। হিন্দু প্রজারা আধমরা হয়ে দিন কাটায়।

সে আমলে জমির উপস্বত্বের কর ছিল চার ভাগের এক ভাগ। তার উপর ছিল হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের ওপর কর। এই সব কর দিতে যারা আপত্তি করত, কিংবা কর দিতে যারা অক্ষম হত তাদের শাস্তি ছিল ভয়ঙ্কর। হিন্দুদের ক্ষেত্রে সে ভয়ঙ্কব শাস্তির নাম ছিল—"বৈকুণ্ঠ বাস।" শাস্তির নাম করণের মধ্যেই অদ্ভুত কটাক্ষ। তহ্‌শীলদারের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল, যাবা রোজা-নামাজ, জিকির-জাকাৎ করে না, যারা পয়গম্বর মহম্মদকে রসুল আল্লা বলে মানে না, সেই সব কাফেরদের যেন কখনও ক্ষমা না করা হয়। নবাবের নির্দেশে কর-দানে অসমর্থ কাফেরদের টেনে হিঁচড়ে আনত নবাবের লোক। টেনে এনে ফেলে দিত এক পুকুরে। পুকুর খুব বড় নয়, কিন্তু তার জল নোংরা, মল-মূত্রে পরিপূর্ণ। এই পুকুরের চারপাশে বসিয়ে রাখা হত তাদের পরিবার বর্গের লোকজনকে। এরই নাম—"বৈকুণ্ঠে বাস।" এরপর পুকুর থেকে তুলে এনে সপরিবারে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হত।

সে সময় ভয়ঙ্কর দিন ছিল হিন্দুদের। পুঁথির লেখক সেই ভয়ঙ্কর দিনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

আচম্বিতে চারিদিকে হইল রাজভয়।
হিন্দুরে ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।

লেখক সেই সময়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বড় করুণ সে কাহিনী।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জেমোকান্দি নামে একটি গ্রাম। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করেন কুলীন ব্রাহ্মণ রাধানাথ মুখোপাধ্যায়।

পরম ধার্মিক, দান-ধ্যান পূজার্চনা নিয়ে থাকেন। সত্যনিষ্ঠ মানুষ। সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না কখনও।

স্বচ্ছল অবস্থা রাধানাথের। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। সংসারও ছোট নয়। নিজের চার ছেলে, চার মেয়ে। ছোট তিন ভাই, তাদের ছেলে মেয়ে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। কৃষাণ-মজুর সব মিলিয়ে এক এক বেলায় এক শো খানা করে পাত পড়ে। এই বিরাট সংসারের মাথায় রাধানাথ। সংসারের সব দিকে তাঁর দৃষ্টি। নিক্তির ওজনে তাঁর বিচার। গৌরবর্ণের এই দীর্ঘ মানুষটিকে কেবল নিজের সংসারের সকলে নয়, সমস্ত গ্রামের মানুষও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

রাধানাথের পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু রাধানাথ হলেন শক্তির উপাসক। তাঁর এই শাক্ত হওয়ার মূলে ছিল একটা বিরাট ঘটনা। সেটা মুর্শিদকুলি খাঁর আমল। গ্রামে তখন বার বার ডাকাতি হত। সাধারণের যথাসর্বস্ব লুঠ করে পালিয়ে যেত তারা। এমনি একটা সময়ে এক রাত্রে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন রাধানাথ। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল, মা কালী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, 'ওরে আর ঘুমোস না, এবার উঠে খাঁড়া ধর। ডাকাতের দল যে এদিকেই ছুটে আসছে।' ঘুম ভেঙে গেল রাধানাথের। সত্যি সত্যি উঠে পড়লেন তিনি। উঠে লোকজনকে ডাকাডাকি করলেন। লাঠি সড়কি হাতে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। রাধানাথের কেমন যেন মনে হতে লাগল আজ নিশ্চয়ই গ্রামে ডাকাত পড়বে, এমন স্বপ্ন মিথ্যে হবে না। সত্যি সত্যি শেষ রাত্রের দিকে হৈ হৈ করে ডাকাতের দল এসে হাজির। এদিকে গ্রামের লোকজন রাধানাথের কথায় রীতিমত প্রস্তুত। তাড়া খেয়ে ডাকাতের দল পালাতে পথ পায় না। সেই যে তাড়া খেয়ে গেল তারপর আর কোনদিন এ-মুখো হয়নি তারা।

সেদিন থেকেই কালীর উপাসক হলেন রাধানাথ। কালী মন্দির প্রতিষ্ঠাও করলেন তিনি। মা কালীই হলেন তাঁর গৃহ দেবতা। মাঝ রাতে সেই দেবীর মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসেন রাধানাথ, আর বেরিয়ে আসেন ভোর বেলা। তারপর শুরু করেন দিনের কাজ।

এক এক দিন সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়ে ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে খোড়ো চালের নীচে মাটির দাওয়ায় বসে গল্প করেন, গল্পের মধ্যে দিয়ে নানান উপদেশ দেন রাধানাথ। তখন বাড়ির আরও সবাই ঘিরে বসে তাঁকে। বৌ-ঝিরা দূরে আড়ালে বসে চুপ করে শোনে। এক এক দিন পুরানো দিনের সব কাহিনী বলেন। এমনি কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, 'জানিস আমার ঠাকুর্দা ছিলেন মস্ত জোয়ান। একবার ডাকাতের একটা মস্ত বড় দল গ্রাম লুঠ করতে এল। ঠাকুর্দা তখন কয়েকশো লেঠেল নিয়ে রুখে দাঁড়াল। ডাকাতরা আর এগোতে পাবল না। অনেকে প্রাণে মরল, কেউ আবার পালিয়ে বাঁচল। ডাকাতরা তো পালিয়ে গেল তারপর এলো নবাবের লোকজন। ফাঁকা মাঠে তাদের কী আস্ফালন! ভাবটা এই, তারাই যেন সব করেছে। শেষ পর্যন্ত নবাবের লোকেরই নাম হল!'

গ্রামের চারদিকে তখন চাপ চাপ অন্ধকার। দূরে দূরে জোনাকির মেলা, একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। গাছগুলো সব জমাট বাঁধা অন্ধকারে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ছেলেরা সব শুনছে। টিম টিম করে জ্বলছে তেলের প্রদীপ। সেই পরিবেশে গল্প শুনতে শুনতে ছেলেদের একজন বলল, 'কিন্তু জ্যেঠু তা' কেন হবে? ডাকাতদের হঠিয়ে দিলে তোমার ঠাকুদা, আর নাম হল কিনা নবাবের লোকের? এটা কেমন করে হয়?'

—তাই হয়রে ব্যাটা, তাই হয়। নবাবের আমলের এই নিয়ম।

কাজ করে সাধারণ লোক নাম হয় নবাবের। এমনি করেই নবাব নবাবী চালায়, নইলে কি ওদের নবাবী চলত?

কথা বলতে বলতে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান রাধানাথ। একটু কাল চুপ করে থেকে বল্লেন, 'এই বিদেশীরা দেশটার ওপর কত নাচাই যে নাচবে! এ-দেশের ভবিষ্যত যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই লক্ষ্মণ সেনের আমলে এসেছিল বখতিয়ার খিলজী। তারপর থেকে কত কি যে হল তার আর ঠিক নেই! হোশেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য দেব না এলে সব তো তলিয়েই যেত।'

—এই নবাবরা এদেশ থেকে কবে যাবে কর্তাবাবু?

বাড়ির কিষাণদের একজন প্রশ্নটা করে বসল।

—ওরা আর কোন দিনই যাবে না-রে। চিরকাল এখানেই থাকবে। এখানে থাকবার জন্যই ওরা এসেছে॥ ওরা কত লোকের ধর্ম নিয়েছে, আরও কত লোকের নেবে কে জানে! আমাদের বড় দুর্দিন রে, আমাদের বড় দুঃসময়!

দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন রাধানাথ।

ছোট ভাই রামকিঙ্কর একটু দূরে বসে। আধো অন্ধকারে তার মুখটা ভাল দেখা যায় না। দাদাকে প্রশ্ন করল সে, 'কিন্তু দাদা, নবাবের ধর্ম যারা গ্রহণ করেছে তারাও তো এ দেশেরই লোক, তারা তো বিদেশী নয়। তবে তারা এ দেশের লোককে কেন পর-পর ভাবে?'

—কে বলেছে তারা আমাদের পর পর ভাবে? আমরাই তো তাদের দূরে সরিয়ে রেখে দি'। তবে এ-কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি, এর ফল কখন ভাল হবে না। বাইরের সবাই এর সুযোগ নেবে। অবশ্য এর প্রতিকার করারও উপায় নেই। শাস্ত্রকাররা যে গণ্ডী টেনে দিয়েছে তার বাইরে যাবার সাহস নাই কারও।

এইটুকু পড়েই থামতে হল আমাকে। অবাক হয়ে ভাবলাম, কে এই রাধানাথ ? সেই যুগে বসে এত দূর ভবিষ্যতের কথা তিনি ভাবতে পারলেন কি করে ? পুঁথি থেকে মুখ তুলতেই রোশেনারার সাথে চোখাচোখি হল আমার। আমার চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, 'কেমন লাগছে ?'

—অবাক হয়ে ভাবছি, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে কেমন পরিষ্কার ধারণা ছিল এই মানুষটির। সেই যুগে বসে এত দূর ভবিষ্যতেব কথা তিনি কি করে ভাবতে পারলেন ? ভাবলে অবাক হতে হয়।

রোশেনারা কোনো উত্তর না দিয়ে হাসি মুখেই চেয়ে রইল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে এই রাধানাথ বলো তো ? ইতিহাসের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি কি ?'

—না।

পুঁথির লেখকের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

—আমাদের সঙ্গে লেখকের যা সম্পর্ক তাই।

—তার মানে রাধানাথ মুখোপাধ্যায় তোমাদের পূর্বপুরুষ ?

—হ্যাঁ।

—তোমরা তাহলে এক কালে হিন্দু ছিলে ?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি আমি। রোশেনারা আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। আমার মনের ভেতর তখন একটা কথাই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল,—রোশেনারার দেহে তাহলে হিন্দুর রক্ত বইছে ? ওরা হিন্দু ছিল। মনের ভেতর যত বারই এই ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল, ততবারই মনকে বোঝাতে চাইছিলাম, এ-অন্যায় ঘোরতর অন্যায়। এই জাতীয়

ভাবনার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার বীজ রয়েছে, মানুষকে ধর্ম দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। এ অন্যায়। মনটা কিন্তু সমস্ত যুক্তিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একই ভাবনার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। বার বার চিৎকার করে সে বলতে চাইল, রোশেনারা আমাদের আপন জন, সে আমাদের কাছের মানুষ, খুবই কাছের। তার পূর্বপুরুষ বাঙালী হিন্দু! মনের এই অদ্ভুত ব্যবহারে নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে রোশেনারা প্রশ্ন করল, 'কি হল তোমার? চুপ করে রইলে যে?'

—ভাবছি।

—কি ভাবছো?

—সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে তোমরা আসলে হিন্দু।

আমার কথায় হেসে ফেলল রোশেনারা। বললে, 'হিন্দু নয়। বলো অনেক পুরুষ আগে তোমরা হিন্দু ছিলে। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি? তাই বলে আমরা তো আর হিন্দু হয়ে যাচ্ছি না।'

—না তা' নয়। তবু—

—ওসব কথা ছাড় তো। পড়ো এবার।

আবার পড়তে শুরু করে ছিলাম আমি। একটানা পড়ে গিয়েছিলাম এবার।

মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শনে বেরোতেন রাধানাথ। সেবার গিয়েছিলেন কাশীধামে। বাল্যবন্ধু হরিহর মিত্র মশাই একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তারই সাহায্যে অন্যান্য যাত্রিদের সঙ্গে নৌকায় গিয়েছিলেম কাশীধামে। তীর্থযাত্রা শেষ করে গ্রামে ফিরবার পথে একবার মুর্শিদাবাদে নামলেন রাধানাথ। বন্ধু হরিহর মিত্রের সাথে একবার দেখা করে যাবেন। মুর্শিদাবাদ শহরে এই তার প্রথম আসা নয়, এর আগেও আর একবার এসেছেন। বন্ধু হরিহর মিত্র যেবার ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে

বদলী হয়ে এলেন সে-বারই প্রথম মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তিনি। তখন সুজাউদ্দিন সবে মসনদে বসেছেন।

বজরা থেকে গঙ্গার ঘাটে নেমে ধীরে ধীরে শহরে ঢুকলেন রাধানাথ। এই শহরে ঢুকলেই সব যেন কেমন গুলিয়ে যায় তাঁর। এলাহি ব্যাপার সব। বড় বড় পাকা সড়ক। ছোট বড় হাজার গলি এসে মিশেছে বড় রাস্তার সাথে। পথে লোক গম গম করছে। ঘোড়া ছুটছে পাল্‌কী চলেছে। সবাই যেন কর্ম ব্যস্ত। বড় বড় পাকা বাড়ি আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চার দিকটা ভালো করে দেখেন রাধানাথ। হরেক রকম জিনিষ থরে থরে সাজানো। আতর-জর্দা-কিমামের গন্ধে ভুর ভুর করছে চারদিক। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েন নবাব প্রাসাদের কাছাকাছি। বন্ধু হরিহর মিত্রের কাছে এই চেহেল সুতুনের অনেক গল্প শুনেছেন তিনি। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন প্রথম এলেন এখানে, তখন তৈরী করেন এই প্রাসাদ। চল্লিশটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এই প্রাসাদ। সুজাউদ্দিন পরে অবশ্য আর একটি প্রাসাদ তৈরী করেন। চেহেল সুতুনের ভেতরে নাকি মহলের পর মহল আছে, আছে দরবার ঘর। বিরাট কালো পাথরের মসনদের ওপর বসে মুর্শিদকুলি খাঁ নাকি দরবার করতেন সেখানে। দূর থেকে প্রাসাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মুর্শিদকুলি খাঁর কথা মনে পড়ল রাধানাথের। ভাবলেন এই মুর্শিদকুলি খাঁর জন্ম হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে অথচ তিনি কি নিদারুণ হিন্দু বিদ্বেষই না ছিলেন! কথাটা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগে রাধানাথের। ভেবে পান না, কী করে এমন হওয়া সম্ভব। কথাটা ভাবতেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। ভাবেন, মুসলমান নবাবদের এই যে এ্যাত ঐশ্বর্য এ-তো শুধু এ দেশীয় হিন্দু প্রজাদের কল্যাণে! অথচ এই হিন্দু প্রজাদের ওপরই যত জুলুম, যত অত্যাচার। ফৌজদার, ডিহিদার, চৌকিদার

প্রভৃতি নবাবের সমস্ত কর্মচারীই এদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। এমন কী কাজীর বিচারও এক পেশে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের মনেই তাঁর আরাধ্যা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মা এ্যাতো আবিচার কি তোর চোখে পড়ে না?'

মনে মনে মাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলতেই ভোরের স্বপ্নটা আবার মনে পড়ল রাধানাথের। এই নিয়ে কতবার যে স্বপ্নের কথাটা ভাবলেন তার ঠিক নেই। কেন যে এমন স্বপ্ন দেখলেন কে জানে!

অদ্ভুত স্বপ্ন। কাশী থেকে ফিরছেন। নৌকো চলছে মাঝ গঙ্গা দিয়ে। সূর্য উঠবার তখনও অনেক দেরী। যাত্রীরা সবাই ঘুমে অচেতন, কেবল মাঝি-মল্লারা জেগে রয়েছে। গঙ্গার অন্ধকার বুকে আরও কয়েক খানা নৌকার আলো দেখা যাচ্ছে দাঁড় টানার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছপ্ ছপ্। আর কোনো শব্দ নেই। ঠিক এমনি এক পরিবেশে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন রাধানাথ।

. আরাধ্যা দেবী মা কালী রাধানাথকে যেন ডাকছেন। ডেকে বলছেন, ওরে রাধানাথ, এবার তোর সামনে কিন্তু নতুন পথ ঐ পথে চলতে গিয়ে যেন পথ ভুল করিস না। এ তোর আর এক পরীক্ষা।'

রাধানাথ অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন তার সেই মৃণ্ময়ী মা-ই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখে এক অপরূপ হাসি। অপূর্ব এক জ্যোতি বেরোচ্ছে তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল থেকে। যে ভয়ঙ্করী নৃমুণ্ডমালিনীর আরাধনা এতদিন তিনি করে এসেছেন এই মৃণ্ময়ী মা যেন তারই এক শান্ত স্নিগ্ধ রূপ। মাকে সামনে দেখে রাধানাথের সমস্ত মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। রাধানাথ একটু কাল স্থির চোখে চেয়ে থেকেই মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, 'না মা আর পরীক্ষায় ফেলিস না। তোর পায়ের নীচে থাকতে দে মা, তোর পায়ের নীচে থাকতে দে"

রাধানাথ উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। এমনি ভাবে পড়ে থেকেই শুনতে পেলেন মায়ের বানী। মা যেন বলছেন, 'ওরে আমি তোর পাশে পাশেই থাকবো, তবে ধরা দেব না। তোকে আমায় চিনে নিতে হবে। ভক্তি দিয়ে তোকে আমায় ধরে নিতে হবে। এই হবে তোর পরীক্ষা।'

রাধানাথ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উঠে বসলেন। মুখ তুলে চাইতেই দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'মাগো কোথায় তুই? ছাখা দে মা, ছাখা দে।'

মাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু মায়ের মিষ্টি সুর ভেসে এলো, 'ওঠ, বোকা ছেলে, ওঠ। চোখের জল মুছে নে। সামনে চেয়ে ছাখ, আমায় দেখতে পাবি।'

চোখের জল মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন রাধানাথ। চাইলেন সামনের দিকে। দেখলেন, দূরে মানুষের একটা মিছিল চলেছে, যেন একটা স্রোত। বিভিন্ন সাজ-পোষাক পরা সে সব মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, বিভিন্ন জাতের মানুষ তারা। কেউ পৈতে ধারী ব্রাহ্মণ। কারও মুখে দাড়ি, মাথায় ফেজ। কেউ বাউল, কেউ ফকির। কেউ বোষ্টম বাবাজী, কেউ গাজী সাহেব। আরও কত রকমের পোষাকধারী মানুষ। মানুষের সেই স্রোতে পুরুষও আছে নারীও আছে। এ যেন পুরুষ-প্রকৃতির চিরন্তনী মিছিল! মানুষের সেই স্রোত চলেছে তো চলেইছে, এর যেন আর শেষ নেই।

কেমন বিহ্বলের মত মানুষের সেই স্রোতের দিকে চেয়ে রইলেন রাধানাথ। এদিক ওদিক খুঁজলেন তাঁর আরাধ্যা দেবীকে। কিন্তু কোথায় কে? আবার কেঁদে উঠলেন তিনি, 'ছাখা দে মা, ছাখা দে।'

মায়ের মিষ্টি গলা শোনা যায় আবার, 'সানেই তো আমায় দেখতে পাচ্ছিস।'

—কোথায় তুই? ও-তো মানুষের স্রোত।

কেমন আচ্ছন্নের মত কথাগুলো বলেন রাধানাথ।

—মহাকালের স্রোত তো এমনি করেই বয়ে চলে।

মায়ের কণ্ঠের স্নিগ্ধতা যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে রাধানাথ, 'না আমি মহাকালের স্রোত দেখতে চাই না। আমি কেবল তোকেই দেখতে চাই। তোকেই পেতে চাই।'

—দূর বোকা, আমি কি কেবল তোর ঐ মূর্তিটুকুর মধ্যেই আছি নাকি? আমাকে পেতে হলে ঐ স্রোতের মধ্যে মিশে গিয়েই পেতে হবে। এবার থেকে এই হবে তোর সাধনা।

—না মা না, আমি তোকেই চাই। মায়ের মত চাই।

মায়ের কণ্ঠস্বর কিন্তু আর শোনা গেল না। মানুষের সেই স্রোত তখনও বয়ে চলেছে। মানুষের পর মানুষ। রাধানাথ আকুল ভাবে মাকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। কেমন অসহায়ের মত মাটির উপর আছড়ে পড়লেন তিনি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাধানাথের। ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সমস্ত শরীর দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে। সারা শরীরে কেমন এক অবসন্নতা। চারদিকটা ভাল করে চেয়ে দেখলেন। সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নৌকা চলছে একই ভাবে। দাঁড় টানার ছপ্ ছপ আওয়াজ। মাঝি মল্লার গান শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কোন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না। কোথায় আছেন, কেন আছেন, সবই যেন কেমন ঝাপসা। কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকার পর স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই কী এক আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন তিনি! তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে এক বিরাট

পরিবর্ত্তন আসছে। এই স্বপ্ন তারই ইঙ্গিত। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন ভেবে পেলেন না।

মুর্শিদাবাদ শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই স্বপ্নের কথাটাই আবার মনে পড়ল রাধানাথের। স্বপ্নের কথাটা মনে পড়তেই কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হতে লাগল, তিনি যেন এই বিশ্বসংসারে অত্যন্ত একা, নিঃসঙ্গ, নিতান্ত অসহায়। তিনি যেন এক মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। তার মাথাটা হাল্কা হয়ে গেছে, দেহটা কেমন ভারশূন্য। ঠিক এমনি যখন তাঁর মনের অবস্থা তখনই চোখে পড়ল এক অদ্ভুত ঘটনা।

জনা কয়েক ফৌজী সৈন্য এক ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে, মাথায় শিখা, গায়ে উত্তরীয়। উত্তরীয়ের এক অংশ মাটিতে লুটোচ্ছে। তাকে একরকম জোর করেই টানতে টানতে নিয়ে চলেছে নবাবের সেপাইরা ব্যাপার দেখে কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন রাধানাথ। রাস্তায় একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এরা এ-ভাবে ব্রাহ্মণকে টেনে নিয়ে চলেছে। উত্তরে লোকটি বললে, 'কেন আর, নবাবের খাজনা বাকী তাই নিয়ে চলেছে বৈকুণ্ঠে বাস করাবে বলে' বৈকুণ্ঠে বাস! এ যে ভয়ানক শাস্তি! আঁতকে উঠলেন রাধানাথ। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে এই ভয়ঙ্কর শাস্তির মাধ্যমে কত হিন্দু যে মুসলমান হয়েছে তার ঠিক নেই! এই ব্রাহ্মণ সন্তানটির কপালে এখনই জুটবে সেই চরম শাস্তি। কথাটা ভেবেই মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে রাধানাথের। বন্দী তখন সেপাইদের কাছে করুণ মিনতি জানাচ্ছে, 'আমায় ছেড়ে দাও তোমরা, নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করবেন দোহাই তোমাদের, তোমরা আমার সব নাও, কিন্তু ধর্ম নিও না'

ব্রাহ্মণের করুণ আকুতি শুনে হেসে ওঠে সেপাইরা। হাসতে হাসতেই বলে, 'চোপ কাফের, বেতমিজ কাঁহিকা। একটাও বাত বলবি না।' আর একজন দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'ধরম নিবি? লে

শালা, এই নে তোর ধরম।' বলেই একটান দিয়ে তার পৈতেটা ছিঁড়ে ফেলে। ব্রাহ্মণের মুখে থু থু ছিটিয়ে দিতে যায়। দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই রাধানাথের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে ওঠে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। ছুটে যান ফৌজী সিপাইদের সামনে। চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'অসুর-নাশিনী মা কোথায় তুই? আয় মা আয় অসুর নিধন কর।' হঠাৎ এই অভাবিত ঘটনায় কেমন যেন হক চকিয়ে যায় সেপাইরা। রাধানাথ মুখে 'জয় মা' বলতে বলতে সেপাইদের এলোপাথারি কিল-ঘুষি ছুঁড়তে থাকেন। সেপাইরা ততক্ষণে সজাগ হয়ে ওঠে। সবাই মিলে চেপে ধরে রাধানাথকে। এতক্ষণে যেন তার সম্বিৎ ফিরে আসে, সমস্ত অবস্থাটার গুরুত্ব বুঝতে পারেন তিনি। কিন্তু তখন আর করবার কিছুই নেই। নবাবের সেপাইরা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে টুঁটি টিপে ধরে রাধানাথের। মাটীতে ফেলে সবাই মিলে মুখে থু থু ছিটিয়ে দেয়। রাধানাথের মুখে তখন একটিই কথা—'এই বুঝি তোর মনে ছিল মা, এই বুঝি তোর মনে ছিল?'

লোকের ভিড় জমে গেল সেখানে। অনেকেই মজা দেখতে লাগল। কাফেরের দশা দেখে হাসতে লাগল অনেকেই। শেষ পর্যন্ত রাধানাথকে মসজিদে টেনে নেওয়া হল। ইমাম সাহেবকে দিয়ে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করা হল। নতুন নাম হল, দবীর খাঁ।

ক'টা দিন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে কাটল রাধানাথের। কোথায় থেকেছেন, কোথায় খেয়েছেন কিছুই মনে নেই। কখন সূর্য উঠেছে, কখন সূর্য ডুবেছে তা-ও যেন টের পাননি। ক'টা দিন এমনি করে কাটাবার পর মনটা যখন একটু শান্ত হল, তখন মনে পড়ল, বাড়ির কথা, ছেলে-মেয়ে আত্মীয় স্বজনের কথা। কিন্তু কী মুখ নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন ভেবে পান না রাধানাথ। মা কালীর ওপর দারুন অভিমানে মায়ের নাম আর মুখে আনেন না।

একবার ভাবেন বাড়ি ফিরে যাবেন, আবার ভাবেন ফিরে গিয়ে লাভই বা কী।

এলোমেলো নানা ভাবনা ভাবতে ভাবতে সেদিন হেঁটে চলেছিলেন গঙ্গার ধার দিয়ে। সেই মাঝ রাত থেকে হাঁটতে শুরু করেছেন। হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। মুর্শিদাবাদ শহর ছেড়ে চলে এসেছেন অনেক দূর, তবু কিন্তু হাঁটার বিরাম নেই। কোথায় চলেছেন তারও কোনো ঠিক নেই। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে, নবাবের লোকেরা একটা কানা কড়িও নেয় নি। যা নেবার তা নিয়েছে মুখে থু থু ছিটিয়ে আর তারপর মসজিদে কলমা পড়িয়ে।

তখন পূবের আকাশ লাল হয়ে সূর্য উঠছে। পরিশ্রান্ত রাধানাথ গঙ্গার এক ঘাটে এসে বসলেন। বসে গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখলেন, জটাজুট-ধারা এক সাধু গঙ্গাস্নান সেরে সূর্য প্রণাম করছেন। সেই নির্জন পরিবেশে সাধুর কণ্ঠস্বর সমস্ত আবহাওয়াকে যেন পবিত্র করে তুলেছে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে কর জোড়ে স্তব পাঠ করছিলেন সাধুজী—

"ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণ তোঽস্মি দিবাকরম্॥"

সাধুজীর কণ্ঠে স্তব পাঠ শুনতে শুনতে মনটা হু হু করে উঠল রাধানাথের। এক মুহূর্তে মনের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। 'তোর আশাই পূর্ণ হোক মা'—বলেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

সাধুজীর ব্যাপারটা বুঝতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল। একটু কাল দাঁড়িয়ে থেকেই বুঝতে পারলেন, লোকটি আত্মহত্যা করতে চলেছে। বুঝতে পেরে তিনিও ঝাঁপ দিলেন। টেনে তুলে নিয়ে এলেন তলিয়ে যাওয়া লোকটিকে।

একটু সুস্থ হতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন রাধানাথ, 'আমায় কেন বাঁচালেন বাবা, আমায় কেন বাঁচালেন? বেঁচে থেকে আমার কি লাভ?'

সাধুজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন রাধানাথের চোখের দিকে। অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'কি নাম তোমার?

—নাম ছিল রাধানাথ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কলমা পড়িয়ে ওরা নাম দিয়েছে, দবীর খাঁ। কেন আমায় বাঁচালেন, বেঁচে থেকে আমি কি করব?

আবার কাঁদতে লাগলেন রাধানাথ শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সাধুজী। রাধানাথের চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল ঝরছে। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর এই প্রথম প্রাণভরে কাঁদলেন তিনি। একটা স্নেহের স্পর্শ পেয়ে নিজেকে যেন ফিরে পেলেন। ধীরে ধীরে বললেন সাধুজী, 'তোমার এ সমস্যা তো নতুন নয়' বাংলা দেশের কত ঘরেই তো আজ এ সমস্যা আরও কত ঘরে এ সমস্যা দেখা দেবে তারও ঠিক নেই। তাই বলে ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

—তাহলে কি করব?

—ঈশ্বর কি কেবল মন্দির আর মসজিদে থাকেন? ঈশ্বর থাকেন মনের মধ্যে। একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম পাল্টালেই কি ঈশ্বর পাল্টে যায়? তা' কি কখনও সম্ভব? তা সম্ভব নয়। যে ভাবে যে নামেই ডাক না কেন যেই ঈশ্বর সেই ঈশ্বর থাকেন। তাই মুসলমানের ঘরে জন্মেও মা কালীর কীর্ত্তন করা যায়, আবার হিন্দুর ঘরে জন্মেও খোদাতালার পরম বিশ্বাসী হওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। নামে কি কিছু এসে যায়?

গঙ্গার বুকে বুক জলে দাঁড়িয়ে কথা হয় দু'জনার। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জিজ্ঞাসা করেন রাধানাথ। 'আমি তাহলে মা কালীকে 'মা' বলে ডাকতে পারব,আগের মতই ডাকতে পারব?"

—কেন পারবে না? জোর করে কি কারও মনের ধর্ম কেড়ে

নেওয়া যায়? তোমার মনে যে নাম খোদাই হয়ে আছে সে নাম তো তোমারই।

—কিন্তু সমাজ যদি না মানে?

রাধানাথের কথায় এবার হা-হা করে হেসে ওঠেন সাধুজী। তাঁর সেই হাসি গঙ্গার বুকে যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে। গোটা সমাজকেই তিনি যেন বিদ্রূপ করেন। তারপর হাসি থামিয়ে বলেন 'বেশ কথা বলেছো বাবা। বলি, ঈশ্বর কি সমাজের দাস যে, সমাজের কথা মত ঈশ্বর ভজনা করতে হবে?'

—কিন্তু সমাজে বাস করে সমাজকে অস্বীকার করব কি করে?

—তাঁর আশীর্বাদ পেলে কে তোমায় স্বীকার করল আর কে অস্বীকার করল তাতে কিছুই এসে যায় না। যে নামে ডাকলে মন আনন্দে ভরে ওঠে সেই নামেই ডাকবে।

এই সহজ সমাধান শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন রাধানাথ। সাধুজী কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। জল থেকে উঠে পড়লেন। তারপর মেঠো পথ ধরে সোজা হেঁটে চললেন একবারও পেছন ফিরে চাইলেন না। খানিকটা সময় সেই বুক জলে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন রাধানাথ। তারপর তিনিও উঠে পড়লেন জল থেকে। স্থির করলেন, তিনি সাধুজীর সঙ্গ নেবেন। কিন্তু তীরে উঠে দেখলেন, সামনে কেউ কোথাও নেই, যতদূর দেখা যায় ধূ ধূ মাঠ। আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাধানাথ, এইটুকু সময়ের মধ্যে এত বড় মাঠটা পেরিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে? তবে কোথায় গেলেন সাধুজী? এধারে ওধারে খোঁজাখুঁজি করলেন অনেক? কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। রাধানাথের মনে সন্দেহ জাগল, কে এই সাধুজী? ইনি তো যে-সে মানুষ নন। তাহলে কি মা স্বয়ং সাধুজীর বেশে এসে তাঁকে উপদেশ দিয়ে গেলেন? কথাটা ভাবতেই প্রচণ্ড আবেগে রাধানাথের চোখে জল এসে গেল। তক্ষুনি স্থির করে ফেললেন, আর দ্বিধা নয়, সমাজ মানুক আর না-ই মানুক,

তিনি তাঁর মাকে ছাড়বেন না। আগের মতই আঁকড়ে থাকবেন। কথাটা ভাবতেই মনটা তাঁর প্রশান্তিতে ভরে গেল।

এরপর আর কোনো দিকে তাকাননি। মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় পেরিয়ে নিজের গ্রামে ছুটে গেছেন।

তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। পথ-শ্রমে ক্লান্ত রাধানাথ নিজের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলেন গোটা বাড়িটাই অন্ধকার। বাড়ির কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না, কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই দেখে মনে হয় যেন একটা পোড়ো বাড়ি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলেন, তবে কি বাড়ির সবাই সব কিছু জানতে পেরেছে ? মন্দ খবর হাওয়ায় ছড়ায়। তাঁর এই ভয়ঙ্কর খবরটিও কি এর মধ্যেই সবার কানে পৌঁছে গেছে ? কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার মত মনের অবস্থা তখন নয়। খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকেই ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতর। ভেতরে ঢুকে সোজা মায়ের মন্দিরে। মায়ের মূর্ত্তির সামনে আছড়ে পড়লেন। চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'তোকে আমি ছাড়ব না মা, কিছুতেই ছাড়ব না।'

নিষ্প্রদীপ বাড়িতে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। কল কল করে উঠল বাড়ির সবাই। আলো হাতে সকলে ছুটে এলো মন্দিরে। মন্দিরে এসে সকলের চক্ষুস্থির। এ-যে বড় কর্ত্তা স্বয়ং ! রাধানাথ তখন মাটীতে মুখ ঘষছেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'আমি তোকে ছাড়ব না মা, কিছুতেই ছাড়ব না।'

কিছুটা সময় সবাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে কি বলবে কিছুই যেন ভেবে পেল না। রাধানাথের কিন্তু কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, একই ভাব তাঁর, সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে একটুকাল সময় লাগল সকলের। রাধানাথের ছোট ভাই রামকিঙ্কর হঠাৎ চীৎকার করলে, 'দাদা তুমি একি করছো ? নিজের ধর্ম গেছে বলে' আমাদের সর্বনাশ করতে চাইছো ? কেন ঢুকেছে মন্দিরে ? মন্দির অপবিত্র

হলে যে আমাদের অকল্যাণ হবে।’

একটা বিরাট ধাক্কা খেলেন রাধানাথ। এতক্ষণে যেন মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন তিনি। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। এক এক করে সকলের মুখের দিকে চাইলেন। বাড়ির ছেলে মেয়ে, বৌ-ঝি, কৃষাণ-মজুর সকলেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সকলের চোখেই জল। মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। সকলের মুখে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ছোট ভাই এর দিকে স্থির চোখে চাইলেন রাধানাথ।

—নিজের ধর্ম গেছে সেই টুকুই থাক। সেই সঙ্গে সকলের সর্বনাশ করো না দাদা। গ্রামের কাক-পক্ষী জানবার আগে তুমি অন্য কোথাও চলে যাও। তোমার খাওয়া পরার ভার আমাদের।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললে রামকিঙ্কর।

—কিন্তু আমার মা?

রাধানাথ অসহায়ের মত চাইলেন ছোট ভাই-এর দিকে।

—ছিঃ দাদা, ও-নাম আর মুখে এনো না। এতে তোমার এবং আমাদের সকলেরই অকল্যাণ হবে। ও-সব কথা ভুলে যাও।

—কী বললি?

হঠাৎ যেন সমস্ত রক্ত একেবারে মাথায় গিয়ে উঠল। চিৎকার করে উঠলেন রাধানাথ, ‘কী, বললি তুই? মাকে ভুলে যাব? এ্যাঁ মাকে ভুলে যাব?

ছুটে গিয়ে ছোট ভায়ের গালে গোটা কয়েক চড় মারলেন রাধানাথ। তাঁর চীৎকারে ছুটে এল পাড়ার লোকজন। রাধানাথের কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছুটে গিয়ে মৃন্ময়ী মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ‘তুই আমার চিণ্ময়ী মা, তোকে আমি ছাড়তে পারব না মা, কিছুতেই না।’

পাড়ার লোকজনের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। সবাই বলতে লাগল, ‘ছি ছি এমন জ্ঞানী-গুণী মানুষের এমন মতিভ্রম!

নিজের ধর্ম তো গেছেই, গৃহদেবতাকে অপবিত্র করে গোটা পরিবারের সর্বনাশ করলে।'

ডিহিদারের কর্মচারী কাসেম খান তুর্কী মুসলমান। লম্বা চওড়া চেহারা। লোকের ভিড়, চিৎকার চেঁচামিচি শুনে কাছে এলো সে। রাধানাথের মুসলমান হওয়ার ঘটনাটা তারও কানে গিয়েছিল। কাছে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেশ কৌতুক বোধ করল কাসেম। হাসতে হাসতে ভাঙা বাংলায় বললে, 'আরে এ মিঞা, বাহার চলে এসো। আমার সঙ্গে এসো গোস্ত্ দিয়ে খানা খাবে। মাটির পুত্‌লী আভি ছুঁড়ে ফেলে দাও। উসব দিয়ে তুমার ক্যা কাম?'

—তবে রে শালা! বাঙলা দেশটাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে! দাঁড়া তোর একদিন কি আমার একদিন!

পাঁঠা বলি দেবার খাঁড়াটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন রাধানাথ।

—কুত্তা, কাফের কাঁহাকা—।

কাসেম কিন্তু দাঁড়াতে সাহস পেল না। ছুটে পালাল। রাধানাথও পিছু ধাওয়া করলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আর ছ' মাস। আর ছ' মাসও টিকবে না তোর নবাব। এত অত্যাচারের ফল তাকে পেতেই হবে।'

তু'জনেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাধানাথের চীৎকার ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল! উপস্থিত সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এত বড় মানুষটা একেবারে পাগল হয়ে গেল!'

রাধানাথ সে রাতে আর ফিরলেন না! পরদিন সকালে গ্রামের প্রান্তে খাঁড়া খানাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল! মানুষটিকে কোথাও পাওয়া গেল না। বস্তুতঃ আর কোন দিনই ফিরে আসেন নি রাধানাথ। তিনি ফিরে আসেন নি বটে কিন্তু তাঁর অভিশাপ মিথ্যে হয়ে যায় নি। আর মাত্র ছ'মাসই মসনদে বসতে পেরেছিলেন নবাব সরফরাজ খাঁ। তারপরই তার দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁরই কর্মচারী হাজী আহম্মদের ভাই আলিবর্দীর হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু সমাজ বড় নিষ্ঠুর। রাধানাথের জন্য গোটা পরিবারকেই জাত-ধর্ম খোয়াতে হল। কেউ রেহাই পেল না। মন্দিরের কালী মূর্তি কিন্তু মন্দিরেই রয়ে গেল, পূজোও হতে লাগল। গ্রামের সবাই এসে পূজো দিত সেখানে। হিন্দু মুসলমান সবাই। গ্রামের সবাই বলতে লাগল খাঁ সাহেবের কালী।

তারপর দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কাটল। রাধানাথ তথা দবীর খাঁর ছেলেরা তখন অনেক বড় হয়েছে। বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েও হয়েছে। তারা সবাই তখন নিয়মিত নমাজ পড়ে, রোজা করে, পয়গম্বর মহম্মদকে রসুল আল্লা বলে মানে। আবার সেই সঙ্গে মায়ের কাছে পূজোও দেয়, মায়ের চরণামৃত মাথায় ঠেকিয়ে দিনের কাজ শুরু করে। এমনি ভাবে যখন দিন চলেছে, তখন খাঁ-দের বাড়ির দরজায় এলো এক অতিবৃদ্ধ বাউল। ধপধপে সাদা দাড়ি। লম্বা চুল একেবারে সাদা। অদ্ভুত তার পোশাক। মাথায় ফকিরের টুপি, হাতে একতারা, গলায় স্ফটিকের মালা, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা।

বৃদ্ধ বাড়ির ছেলেদের ডেকে ডেকে আদর করে। বৃদ্ধের ঠোঁটে এক ফালি মিষ্টি হাসি সব সময় লেগেই আছে। বাচ্চারা তাকে জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁ গো কি নাম তোমার? কোথায় বাড়ী? কোথায় থাক?'

বৃদ্ধ হেসে উত্তর দেয়, 'কোথাও আমার বাড়ি নেইরে ভাই, তবে আস্তানা আছে সর্বত্র। আর নাম? নাম কিছু নেই। সবাই বলে, গাজী বাবাজী। সবাই যা বলে ডাকে আমি তা-ই।'

আশেপাশের লোকেরা কথাটা শুনতে পেয়ে বলে, 'সে কি গো বুড়ো, যে-গাজী সেই আবার বাবাজী হয় কি করে? হয় বলো গাজী সাহেব, না হয় বাবাজী। দুটো তো হয় না।'

—হয় গো হয়। এ হল বাংলা দেশ, সব অমিলের মিল এখানে। এখানে সব কিছু মিলে মিশে একাকার। যে গাজী সেই এখানে বাবাজী। জল পানি এক। আল্লা কালী ভিন্ন নয়।

মিটি মিটি হাসতে হাসতে কথা বলে গাজী বাবাজী। তারপর ধীরে ধীরে একতারা বাজিয়ে গান ধরে—

ধর্মাধর্ম জাত-কুল যত কড়াকড়ি।
বঙ্গভূমে পড়ি গ্যাখো যায় গড়াগড়ি॥
যে গাজী সে বাবাজী ঘোচে ভেদের ক্লেশ।
সত্যপীর পূজে গাজী বাবাজীর দেশ॥

বলতে গেলে পুঁথির কাহিনী এখানেই শেষ। এর পরের কতগুলো পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু পোকায় কেটেছে, কিছু জল লেগে বা অন্য কোনো ভাবে নষ্ট হয়েছে। একেবারে শেষের কয়েকটা পাতা অবশ্য আছে। সেখানে পুঁথির কবির নাম, তাঁর বংশ পরিচয় দেওয়া আছে। কবির নাম গরিব খাঁ। দবীর খাঁ তার ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ। গরিব খাঁ তাঁর পিতা ও পিতামহের কাছে দবীর খাঁ সম্বন্ধে যা যা শুনেছেন হুবহু তা-ই বর্ণনা করেছেন। জ্ঞাতসারে কোথাও কোনো বাড়াবাড়ি করেননি বলে তিনি মনে করেন। কবি উপসংহারে বলেছেন, দবীর খাঁর মত মহান ব্যক্তি যে বংশে জন্মেছেন সেই বংশের কেউ যেন খোদাতালা এবং ঈশ্বর নিয়ে বিবাদ না করে। আরও বলেছেন, ধর্ম নিয়ে বিবাদ বাংলাদেশের জল-হাওয়ার পরিপন্থী। কেউ যদি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তবে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী গাজী বাবাজীর এই দেশ তাকে ক্ষমা করবে না।

পুঁথির একেবারে শেষ পাতায় ভিন্ন কালিতে ভিন্ন হাতের লেখায় একটি বংশ তালিকা দেওয়া আছে। তালিকার প্রথম নামটি দবীর খাঁ এবং শেষ নামটি মনসুর আলি খাঁ। শেষ নামটি

ছাড়া প্রত্যেকটি নামের পাশে জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ দেওয়া আছে। শেষ নামটির পাশে কেবল জন্মের তারিখ।

পুঁথিটা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলাম একটু কাল। পুঁথির কাহিনী তখন মাথার মধ্যে ঘুরছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও বার বার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, কে এই মনসুর আলি খাঁ? দবীর খাঁর শেষ বংশধরের সাথে রোশেনারার কি সম্পর্ক? তাছাড়া আর একটা অদ্ভুত মিল। পুঁথির শেষ পাতাটি যার হাতে লেখা, তার লেখার সঙ্গে শেকস্‌পীয়ারের বইএর মধ্যে যে লেখাটা একটু আগে দেখেছিলাম, সেই লেখার অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন একই হাতের লেখা। কিন্তু কে এই ব্যক্তি? রোশেনারার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক? রোশেনারার পিতার নাম জানি, জহিরুল। বংশ তালিকায় তার তো নাম নেই। কেন নেই? একটা বিচ্ছিরি চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

মাস দেড়েক অফিস নিয়ে একেবারে নাকানি চোবানি খেলাম। সেল্‌স এর কাজ আমার। কয়েকটা কনসাইনমেণ্টে সামান্য ডিফেক্ট থাকায় সমস্ত জিনিসগুলো ফেরত চলে আসছিল। কয়েক লাখ টাকার ইনভলভমেণ্ট। তাই নিয়ে অফিস থেকে বোর্ড অব ডাইরেকটরস পর্যন্ত তুলকালাম কাণ্ড। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি হল। কাজেই অনেক দিন পর মনটা বেশ হালকা। ভাবলাম, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে কফি হাউসে গিয়ে খানিকটা আড্ডা মেরে আসি। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের দু'এক জনকে যদি পেয়ে যাই, তাহলে খারাপ কাটবে না।

কফি হাউসে ঢুকে কিন্তু থ'মেরে গেলাম। দেখি, একটা টেবিল ঘিরে এক দঙ্গল ছেলে নিয়ে শুভাশিস আড্ডা মারছে। ছেলেদের চেহারা দেখে মনে হয় সবাই নয়া প্রফেসর। পরে জেনেছিলাম, আমার ধারনা ষোলো আনা ঠিক। প্রফেসরদের যে ইউনিয়ন আছে তারই সূত্র ধরে ওদের নতুন বন্ধুত্ব। তা হোক। কিন্তু অবাক লাগল, বহরমপুর থেকে ফিরে এসে আমাকে কিছু জানাল না দেখে। সত্যি মনে মনে আহত হলাম আমি। আহত হবার অন্য একটা কারণও ছিল। দেখলাম, ছেলেদের দঙ্গলের মধ্যে রোশেনারাও বসে আছে। তার মানে, কলকাতায় এসে রোশেনারার খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু আমাকে কোন খবর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি।

আমি ক্ষুব্ধ মনেই ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শুভ কিন্তু

আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'কী রে রথী, সেল্‌স-এর ডুব জল থেকে উদ্ধার পেলি ? তোর অফিসে গিয়ে তো শুনলাম, ছোটা সাহেব ডিফেকটিভ কনসাইনমেণ্ট নিয়ে মাঝ সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে নাকি লাইফ বোটের প্রয়োজন হতে পারে।'

শুভর কথায় মুহূর্তে আমার ক্ষোভ-টোভ উড়ে গেল। রোদ-ঝলমল মন নিয়ে বললাম, 'আমার অফিসে গিয়েছিলি নাকি ?'

'গিয়েছি মানে ? আজ সাতদিন ধরে রোজ খবর নিচ্ছি, সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলি কি না।'

'আশ্চর্য ছেলে তো। সাত দিন হল এসেছিস, অথচ—বাড়িতেও তো যেতে পারতিস।' বললাম আমি।

'ক্ষেপেছিস ? সারাদিন অফিসে বসে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করছিস। তারপর আবার বাড়ি। তবে যেতাম। আমার ছুটি ফুরোবার আগে যদি পাড়ে উঠতে না পারতিস তাহলে নিশ্চয়ই যেতাম। যাক গে, বোস। বুঝতে পেরেছি, এখন ভালই আছিস।'

আমি বেবীর পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম। আমি বসতেই আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল শুভ। পরিচয়েই টের পেলাম, এর মধ্যে দু'একজন নেতা গোছের অধ্যাপকও আছে। সে যা হোক। পরিচয়ের পালা শেষ হলে বেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি রোজ এখানে আসছ নাকি ?'

বেবী হেসে বলল, 'রোজ কি আর অফিস ফাঁকি দিয়ে আসা যায় ? দুদিন এলাম। গতকাল, আর আজ।'

আমাদের কথার মধ্যেই আর একজন এসে উপস্থিত হল। তার বয়েস আমাদের চেয়ে সামান্য বেশীই হবে। শ্যামলা রঙ। আঁটসাট চেহারা। মুখের গড়ন সামান্য লম্বাটে। ছেলেটি আসতেই সবাই তাকে হৈ চৈ করে সম্বর্দ্ধনা জানাল। তারপর সবাই প্রায় এক সঙ্গে অভিযোগ করল, 'এই দু'দিন এখানে আসা হয় নি কেন ? এ্যাঁ ?'

'কাজ ভাই কাজ। একটা কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম। জানিস তো কাজ বড় বালাই। অড্ডা-টাড্ডা কিছুই মানে না।' বলতে বলতে ছেলেটি আমার দিকে ফিরে বলল, 'এঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না, ভাই।'

শুভ আমার পরিচয় দিয়ে ছেলেটির পরিচয় দিল। ওর নাম শেখ সামসুল হক। ঢাকা ইউনিভারসিটির কৃতি ছাত্র। ওখানেই এক কলেজে পড়ায়। তাছাড়া ওখানকার একজন নামী কবি। পলিটিক্সে প্রচণ্ড নেশা। কলকাতায় এসেছে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে রিসার্চ করবে বলে।

সামসুলের পুরো পরিচয় পেয়ে ওর ওপর শ্রদ্ধা হল খুব। এই ব্যাপারে আমি হয়তো কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলাম। সামসুল হাত তুলে বলল, 'আমার কিন্তু, ভাই, চটকরে তুই-তুকারি মুখে চলে আসে। কিছু মনে কোরোনা যেন।'

হেসে বললাম, 'না না মনে করব কেন? এ-তো খুব ভালো কথা।'

আমাদের পরিচয়ের পালা শেষ করে শুভ এবার বেবীর পরিচয় দিতে গেল। কিন্তু পরিচয় দেবার মুহূর্তে সামসুল বাধা দিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু একে চিনি।'

শুভ তাড়াতাড়ি বলল, 'তাই নাকি? তাহলে এতক্ষণ বলিসনি কেন?'

বেবী অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'আমি ঠিক চিনতে পারছি না।'

সামসুল সামান্য হেসে বলল, 'তোমাদের দেশ এক সময় মুর্শিদাবাদে ছিল তো?'

—শুনেছি অনেক দিন আগে ছিল।

—বেশ। আর বাবার নাম, মরহুম মনসুর আলি খাঁ? এ্যাম আই রঙ?

হকের কথায় ঢোক গিলল রোশেনারা। আমার দিকে আড়-

চোখে একবার চাইল। তারপর ঘাড় কাৎ করে বলল, 'ঠিকই বলেছেন।'

ওর উত্তরে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। বলছে কি রোশেনারা? ওর বাবার নাম তো মনসুর আলি নয়। ওর বাবার নাম তো জহিরুল ইসলাম বলেই জানি। তাছাড়া বাবার নামের আগে মরহুম বলছে কেন? মৃত জনের নামের আগেই তো মরহুম হয়। তবে?

সামসুল সোৎসাহে বলল, 'তাহলে সব মিলেছে? আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন। তোমার বাবার তো খুব শিকারের সখ ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—সেবার শিকার থেকে ফিরে হঠাৎ পেটে কিসের একটা যন্ত্রণা ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই মারা যান। আমরা পরে সেই খবর শুনেছি।

রোশেনারার মুখটা হঠাৎ কেমন কালো হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য একটা কথাও বলতে পারল না।

সামসুল একটু কাল চুপ করে থেকে আগের কথার জের টেনে বলল, 'মনসুর চাচার মৃত্যুর খবর শুনে আমার বাবা দুদিন খেতেই পারেন নি। একা চুপচাপ বসে থাকতেন। বাবা তারপর একদিন আমাদের দুই ভায়ের দুই কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'মনসুর যে কত ভাল লোক ছিল তা' তোদের বলে বোঝাতে পারব না। আল্লাহ্ তাই বুঝি এত তাড়াতাড়ি ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।'

কথা বলতে বলতে সামসুল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হয়তো এক মুহূর্ত অতীতের দিনগুলোতে ফিরে গেল সে। সমস্ত আবহওয়াটা কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। রোশেনারা কি করবে, কি বলবে, কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না। আমার কিন্তু

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ল, রোশেনারার ঘরে টাঙানো সেই ফটোটার কথা। শিকারীর পোষাক-পরা সেই ভদ্রলোকের মুখটা মনে পড়ল। সামসুলের কথায় বুঝতে অসুবিধে হল না, তিনিই রোশেনারার পিতা, মনসুর আলি খাঁ। দবীর খাঁর শেষ বংশধর। আর জহিরুল ইসলাম? তিনি নিশ্চয়ই রোশেনারার সৎ পিতা। কিন্তু রোশেনারা কেন যে এ কথাটা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছে বুঝতে পারলাম না।

আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। শুভাশিসই এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে সবাইকে বাঁচিয়ে দিলে। সামসুলের দিকে চেয়ে বলল, 'আচ্ছা গেরো তো। তুই ওর সব কিছু ফিরিস্তি দিতে শুরু করলি অথচ নিজের কথা কিছুই বলছিস না। তোর নিজের দিকটা একটু পরিষ্কার করে না বললে ও বেচারী তোকে বোঝে কি করে?'

সামসুল একটু হেসে রোশেনারার দিকে চেয়েই বলল, 'আমার দিকটা পরিষ্কার' করার আগে তাহলে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে হচ্ছে।'

—বেশ তো বলুন না।

এতক্ষণে বেশ সহজ হয়ে উঠল রোশেনারা।

'হুঁ'। ছোট্ট একটা শব্দ করে একটুকাল চুপ করে রইল সামসুল। তারপর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক দিন আগে আমরা সবাই মিলে একবার চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ছিল আর একটি পরিবার। বলতে গেলে তাঁরা আমাদের আত্মীয়ের মতই। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। আমারও বয়েস বেশী নয়, তবে মেয়েটির চাইতে আমি বেশ বড়। আমার হাতে ছিল একটা মাউথ অরগ্যান। আমার খুবই প্রিয় সেটা। সেই ছোট্ট মেয়েটি হঠাৎ বায়না ধরল, ঐ মাউথ অরগ্যানটা তার

চাই। আমি ওর চাইতে বড়, কাজেই আমায় সবাই বুঝিয়ে বললে, ওকে ওটা দিয়ে দিতে। আমি কিন্তু কিছুতেই দেব না। ফলে মেয়ের প্রচণ্ড কান্না শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা তখন আমার ওপর রেগে গিয়ে হাত থেকে মাউথ-অরগ্যানটা কেড়ে নিতে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুট। কিন্তু ছুটতে গিয়েই একটা ইঁটে পা লেগে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লাম। হাত-পা কেটে গেল। থুতনি কেটে গিয়ে দারুণ রক্ত পড়তে লাগল। ব্যাস, আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের কান্না উল্টো খাতে বইতে শুরু করল। কেন আমার কাছ থেকে মাউথ-অরগ্যানটা কেড়ে নিতে যাওয়া হল। কেন লাগল আমার,—এবার এই নিয়ে তার কান্না। তারপর—।'

—আরে সামুভাই তুই!

সামসুলের কথার মাঝখানেই বলে উঠল রোশেনারা। ওর মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। সামসুলের দিকে অনেকটা ঝুঁকে বলল, 'ছাখতো কী কাণ্ড! তোকে একদম চিনতে পারিনি! কি লজ্জা বলতো? আনসার চাচার ছেলেকেই কিনা ভুলে গেলাম! ছি-ছি!'

—আরে এতে লজ্জার কি আছে? কম দিন তো হল না?

—তা বটে সেই কবে দেখা!

একটু থেমে আবার বলল, 'ছেলেবেলায় তুই কী বিচ্ছুই না ছিলি! বাপরে বাপ্। অবশ্য এখনও কিছু কম বলে মনে হচ্ছে না।'

—আর তোর নাকে কান্নাটা? সেটাও নিশ্চয় একই রকম আছে?

সামসুলের কথায় হেসে ফেলল রোশেনারা। সে-হাসিতে আমরাও যোগ দিলাম। সামসুল সবার দিকে চেয়ে বলল, 'পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল, অতএব কিছু পটাটো চিপস হয়ে যাক?'

—হোক-হোক।

সকলে একসঙ্গে সমর্থন জানাল

রোশেনারা আবার বলল, 'হ্যাঁরে তোদের মুর্শিদাবাদের বাড়িটা কি করলি?'

—ঢাকার এক হিন্দুর বাড়ির সঙ্গে ওটার একস্‌চেঞ্জ করেই তো আমরা পাকিস্তান পাড়ি জমিয়েছিলাম।

একটুকাল চুপ করে রোশেনারা বলল, 'সত্যি কতদিন পরে তোর সঙ্গে আবার দেখা! কী ভালই যে লাগছে! তা হ্যাঁরে আজ আমাদের বাড়ি যাবি তো?'

—না, আজ হবে না। আর একদিন যাব। তোদের ঠিকানাটা দে, কলকাতায় তো রইলাম, যে কোনো একদিন যাব। তাছাড়া তোর সঙ্গে তো মাঝে মাঝে দেখাও হবে।

—তা হলেও বাড়ি যেতে হবে।

—যাব, যাব।

—বিয়ে করেছিস তো? প্রশ্ন করল রোশেনারা।

—উঁ হুঁ, সময় হয়নি।

ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে উত্তর দিল সামসুল।

ইতিমধ্যে পটাটো চিপস্ এসে গেছে, তার দু'একখানা মুখে পুরতে পুরতে শুভর দিকে চেয়ে এবার বলল সামসুল, 'বল্ তোদের কি আলোচনা চলছিল?'

—ঐ সমীরটা একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন তুলেছে। উত্তর দিল শুভ।

—কি প্রশ্ন? সমীরের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল সামসুল।

শুভাশিসের পাশের ইনটেলেকচুয়াল মার্কা চেহারার ছেলেটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'একটা জাতির ইউনিটি নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

—কি কথা?

পটাটো চিপস্ চিবোতে চিবোতে হাল্কা ভাবে প্রশ্ন করল সামসুল।

—এই প্রসঙ্গে আমি বলছিলাম যে, একটা জাতির ইউনিটির মূল হল ধর্ম। ভাষা এবং সংস্কৃতি যদি এক হয় তবে খুবই ভাল, কিন্তু ধর্ম এক না হলেই চলবে না। ধর্মই হল আসল ভীত্।

দু'হাত নেড়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল ছেলেটি।

চোখ সূক্ষ্ম করে, এবং সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা মুখের ভঙ্গি করে সামসুল বলল, 'মনে হচ্ছে, তুই টু-নেশন থিওরির বুলি কপচাবার ধান্দায় আছিস? জিন্না সাহেবের স্যাঙাতের মত কথা বলছিস যেন?

—জিন্নার স্যাঙাত বলে ঠাট্টাই করো, আর যাই করো, কথাটা উড়িয়ে দিতে পারবে না। ইংরেজ জাতির গোড়ার অবস্থার কথাটাই ধরো। এ্যাংলো-স্যাকসন-ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি পাঁচ মেশালিদের মধ্যে যে কোন্দল ছিল ধর্মের বাঁধন না থাকলে সেটা কি সহজে মিটত? সকলে এক ধর্মের আওতায় এসেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ একটা এতবড় শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইউনিটির ক্ষেত্রে ধর্ম একটা বিরাট ফ্যাক্টর। এত বিরাট যে অন্যগুলোর অস্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়।

—তোর কথাই যদি সত্যি হবে তাহলে ইউরোপে এতগুলো জাতি হত না। আসলে, একটা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মটা বাহুল্য মাত্র।

—তাই যদি হবে আমাদের দেশে তা হল না কেন? পাকিস্তান কেন তৈরী হল? এটা তো বাস্তব, একে অস্বীকার করবে কি করে?

—অস্বীকার তো করছি না। পাকিস্তান যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা কে অস্বীকার করছে? তবে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে ধর্ম নয়। ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছে, কেবল মাত্র তৃতীয় শক্তির অনুপ্রবেশ

ঘটেছিল বলেই। ইংরেজ যদি আমাদের মধ্যে না থাকত তবে সমস্ত অবস্থাটাই অন্য রকম হত। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ যদি হতও, তাহলেও তার মীমাংসা দেশ ভাগ করে করতে হত না। অন্য কোনো ভাবে এর মীমাংসা হত।

সামসুলের কথা শেষ হতেই শুভাশিস বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়, বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমানের যে বিবাদ তার মুখ্য কারণ ধর্ম নয়। তার আসল কারণ অর্থনীতি।'

— অর্থনীতি ?

শুভ-র সামনে চেয়ারে বসা ছেলেটি চোখ বড় করে প্রশ্ন করল।

শুভাশিসের কথায় সামসুলের চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল মনে হল। ছোট্ট এক টুকরো হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটের কোণে।

'হুঁ অর্থনীতি।' শুভাশিস বেশ জোর দিয়েই বলল কথাটা। একটু থেমে আবার বলল, 'তখনকার সামাজিক অবস্থার কথা ভেবে দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। আমাদের দেশটা হল কৃষি প্রধান। আর এই দেশের সমাজের নীচের তলায় যারা ছিল তারা বেশীর ভাগই, হয় ছোট চাষী না হয় কৃষি মজুর। এবং এদের বেশীর ভাগের ধর্ম ইসলাম। আবার উল্টো দিকে তখনকার বড় জমিদার, জোতদার, বড় চাষী কারা ছিল ? না, হিন্দু। এই হিন্দু-জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার স্বাভাবিক ভাবেই গিয়ে পড়ত মুসলমান প্রজাদের ওপর। ফলে এই সব জমিদার জোতদারদের তো তারা শত্রু বলে মনে করতই, সেই সঙ্গে গোটা হিন্দু সমাজের ওপর তাদের বিতৃষ্ণা জন্মাতে শুরু করল। এরই সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজ। বিভেদের বীজটা আগেই ছিল, তাই সমস্ত দোষটা ইংরেজের ওপর চাপিয়ে দিতে আমি রাজী নই।'

'তোর কথা ঠিক।' 'সোজা হয়ে বসে বলল সামসুল,

'কিন্তু তোর কথার সঙ্গে আমি আরও একটু যোগ করতে চাই।'

—কি?

—তখনকার মুসলমান সমাজে মারাত্মক একটা অভাব ছিল। সেটাও একটা বিশেষ কারণ।

—কিসের অভাব?

—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই হচ্ছে একটা জাতির মেরুদণ্ড। তারাই একটা সমাজের সংস্কৃতি বল, আর কালচারই বল, তার ধারক ও বাহক। অথচ সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল না মুসলমান সমাজে। ভেবে ছাখ, একটা সমাজের পক্ষে এটা কি নিদারুণ সঙ্কট!

—কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না কেন?

হঠাতই প্রশ্নটা করে বসল রোশেনারা। প্রশ্নটা শুনে সবাই এক সঙ্গে ওর দিকে চাইল। সকলে একসঙ্গে চাইতেই রোশেনারা যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

সামসুল রোশেনারার দিকে চেয়েই উত্তর দিল। বলল, 'এর মূলেও সেই অর্থনৈতিক প্রশ্ন। অবিভক্ত বাংলার মুসলমান সমাজে ছিল দুটো শ্রেণী। একটা শ্রেণীতে ছিল ওপর তলার ধনী মানুষ। আর একটা শ্রেণীতে একেবারে নীচু তলার খেটে খাওয়া মানুষ। ওপর তলার ধনী মুসলমানরা প্রতিযোগিতা করত তাদের কাউণ্টারপার্ট হিন্দু জোতদার জমিদারের সঙ্গে। আর এই প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েই তারা তাদের কালচারের পীঠস্থান হিসেবে ধরে নিয়েছিল আরব-তুরস্ককে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কালচারের কিছু কিছু প্রভাব পড়তে লাগল নীচু তলার মানুষের ওপর। অন্যদিকে আবার এই গরীব মানুষগুলোর শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ নেই, স্কুল কলেজের মুখ তারা দেখতে পায় না। ফলে কুসংস্কার মুক্ত, সংস্কৃতিবান

মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠবার সুযোগই পেল না। বৃটিশ সরকার এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। কেবল বৃটিশই নয়, তাদের সঙ্গে এদেশেরও কিছু সুবিধাবাদী লোক এই সামাজিক অবস্থাটা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এবং এর শেষ পরিণতি হল, পার্টিশান। দেশ বিভাগ।'

সামসুলের কথার পিঠে পিঠেই শুভাশিস বলে উঠল, 'পার্টিশন হওয়াটা দুঃখের ঠিকই, তবু আমি বলবো, পার্টিশন হওয়া এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তোর কি মত?'

—রূঢ় হলেও কথাটার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

একটু থেমে সামসুল আবার বলল, 'এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই পার্টিশনের ফলেই ওপার বাংলার মুসলমান সমাজে আজ দ্রুত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে সুযোগ পেয়েছে। এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠার ফলেই ওপার বাংলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল সামসুল।

সামসুলের কথায় শুভাশিস চোখ দুটো সূক্ষ্ম করে বলল, 'নবজাগরণ? নবজাগরণ বলতে তুই কি বলতে চাইছিস?'

—বলছি একটা উপলব্ধির কথা। আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, আমরা বাঙালী—সে হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই। ওপার বাংলায় এই উপলব্ধিটা আজ দানা বেঁধে উঠেছে। নিজেদের আজ তারা চিনতে শিখেছে। এইটেই নব জাগরণ। এই যে নিজেকে চিনতে শেখা এর ফল সুদূর প্রসারী।'

সামসুল আবার সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, 'ধর্মের রোলার ঠেলে ঠেলে মানুষকে অনেকটা পেষা যায় ঠিকই, ধর্মের আফিং খাইয়ে মানুষকে দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যায় তা-ও ঠিক। কিন্তু অন্য সব কিছুর মত এরও একটা সীমা আছে। এই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই মানুষ মরীয়া হয়ে ওঠে। ওপার

বাংলার মানুষেরও আজ তাই হয়েছে। তাদের আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা আজ মরীয়া।'

একটুকাল চুপ করে রইল সামস্থল। তারপর কেমন আনমনা ভাবে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'ধর্মের নামে এতদিন আমরা অনেক কিছু ত্যাগ করেছি, অনেক কিছু সহ্য করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার ওপর যখন হাত পড়ল, তখন আর পারলাম না। মনে হল, আমাদের হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি উপড়ে ফেলা হচ্ছে। এক মুহূর্তে আমরা আমাদের চিনতে শিখলাম। বুঝলাম, আমাদের দেশ ইরাণ-তুরস্ক নয়, ধূ ধূ মরুর ইশারা আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না। আমাদের দেশ এমন একটি দেশ গোটা পৃথিবীতে যার তুলনা মেলা ভার।'

একটু থামল সামস্থল। খুব অন্যমনস্ক মনে হল ওকে। ওর চোখ দেখে মনে হল, ও যেন কোন এক কল্প-লোকের সন্ধানে ব্যস্ত। চুপ চাপ কাটল কয়েকটা মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগল,—

"পৃথিবীর কোনো পথে ঃ নরম ধানেব গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সর পুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—
শীত হাত খান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথা ঘাস,—লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ;
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।"

আবৃত্তি শেষ করে আস্তে আস্তে বললে, 'একুশে ফেব্রুয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে নরম ধানের গন্ধে-ভরা এই বাংলার প্রাণের সন্ধান পেয়ে গেলাম আমরা। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের সুধা দিয়ে গড়া যে-ভাষা সেই ভাষাকে মুক্ত করতে গিয়ে পরম জিনিষটির সন্ধান পেলাম। হঠাৎ যেন সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।'

—দেশ ভাগ না হলে এই পরম জিনিষটির সন্ধান হয়তো কোন দিনই পাওয়া সম্ভব হত না। তাই না? আমার তো তাই মনে হয়।

সামসুলের দিকে চেয়ে বলল শুভাশিস।

সামসুল অন্যদিকে তাকিয়েই ধীরে ধীরে বলল, 'হয়তো তাই। দেশ ভাগ না হলে বাঙালী মুসলমান সমাজে আজও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে সুযোগ পেত কিনা সন্দেহ।'

ঢোলা পাঞ্জাবী-পরা নেতা-অধ্যাপকটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে শুনছিল এবং একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। সেই ছেলেটিই এবার মুখ বিকৃত করে বলল, 'যত্ত সব রাবিশ ব্যাপার।'

সামসুল যেন একটু আহত হল। ভুরু কুঁচকে ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, 'হঠাৎ রাবিশ ব্যাপার কোথায় দেখলি?'

—তাছাড়া কি? আজকের যুগে বসে এই সব আলোচনার কোনো মানে হয়?

—কোন সব আলোচনা?

—এই যে, ধর্ম, মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

—কেন আজকের যুগে এই সব আর নেই নাকি?

চোখ দুটো ছোট করে প্রশ্ন করল সামসুল।

—আছে। তবে এসব নিয়ে মাতামাতি করার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজকের যুগ শ্রেণী সংগ্রামের যুগ। আজকের যুগে কেউ আর ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। জীবনে ওটা একটা বাহুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের শ্রেণী সংগ্রামের যুগে মধ্যবিত্ত সমাজের গুণ-কীর্তন করা রি-এ্যাকশনারী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়।

—তাই নাকি? তাহলে বল ধর্মের প্রভাব থেকে আমরা আজ একেবারেই মুক্ত হয়ে গেছি? তাছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজেরও আজ আর কিছুই দেবার নেই, তার দিনও ফুরিয়ে গেছে।

কথাটা শেষ করে মুখে এক রকম চুক চুক শব্দ করে বলল সামসুল, 'সত্যিই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না-রে, এর জন্য আমি দুঃখিত।'

ছেলেটি সামসুলের কথায় চটে গেল। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললে, 'ঠাট্টা করছো? তা করো। তবে এ-কথা আমি জোর গলায় বলবো যে, তোমাদের চিন্তায় প্রতিক্রিয়াশীলের ছাপ রয়েছে। তোমাদের চিন্তা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না।'

সামসুল হেসে বলল, 'তাহলে তোর কাছ থেকে একদিন জিনিষগুলো ভাল করে বুঝে নিতে হচ্ছে। অবশ্য আজ হলেই ভাল হত। কিন্তু আজ আর বেশীক্ষণ বসতে পারছি না। আমি দুঃখিত।'

কথাটা শেষ করে আবার একটু হাসল সামসুল। সে হাসিতে যেন একটা বিদ্রূপের ঝিলিক। ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা গেল, সামসুলের কথায়, সামসুলের হাসিতে ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। কেমন গুম হয়ে রইল ছেলেটি।

একটু পরেই উঠে পড়ল সামসুল। সেই সঙ্গে আমাদের সভাও ভঙ্গ হল।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে একসঙ্গেই চললাম আমরা তিন জন। হাঁটতে হাঁটতে সামসুলের কথাই ভাবছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেটি আমার মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঘুরে ফিরে তাই কেবলই ওর কথাগুলোই মনে পড়ছিল। শুভাশিসের দিকে চেয়ে এক সময় বললাম, 'অদ্ভুত ছেলে তোদের এই সামসুল হক। ওর সঙ্গে সামান্য মিশলেই মনের ওপরি ওর প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

—হুঁ।

ছোট্ট একটা জবাব দিল শুভাশিস। খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বললে, 'সামসুলের কথাবার্তা থেকে কেমন মনে হচ্ছে,

ওপার বাংলার মানুষের মনে আজ অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। নানা কারণে তারা বর্তমান সরকারের উপর অসন্তুষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে ওখানে কোনো বিরাট রকমের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব ভেতরে ভেতরে সে-আন্দোলনের প্রস্তুতিও চলছে। আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তুতির কাজে সামসুল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।'

—হঠাৎ তোর এ ধারণা হল কি করে?

—হঠাৎ নয়। ওর সঙ্গে নানা বকমের আলোচনার ফলেই এই ধারণা জন্মেছে। এ-টুকু পরিষ্কার বুঝেছি, দেশকে ও যে ভাবে ভালবাসে তাতে দেশেব জন্য কোনো কিছু করাই ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। ওর কাছে দেশের অর্থ, বাংলা দেশ। বাংলার জন্য ও সব কিছু করতে পারে। বাংলাই ওর ধ্যান-জ্ঞান। আমার মনে হয়, ওকে আমরা পুরোপুরি চিনতে পারিনি। যতটুকু বড় বলে মনে হয়েছে, আসলে ও তার চাইতে আরও অনেক অনেক বড়।

থামল শুভাশিস। আমি বা রোশেনারা কেউ কোন কথা না বলে চুপ করেই রইলাম। কিছুটা সময় নিঃশব্দেই কাটল। হাঁটতে হাঁটতে শুভাশিসের মুখের দিকে চেয়ে রোশেনারা এক সময় বললে, 'রথী, তুমি বোধ হয় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছো?'

কিছু বুঝতে না পেবে ভ্রূ কুঁচকে রোশেনারার মুখের দিকে চাইলাম।

রোশেনারা নিজেই আবার কথাটা পরিষ্কার করে বলল, 'আমি জানি, সামুভাই-এর কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে। সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে। অনেক আগেই কথাটা বলা উচিত ছিল।'

আমরা দু'জনেই ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। রোশেনারা একটু কাল চুপ করে থেকে বললে, 'আমার বাবা বেঁচে নেই। অনেক আগেই মারা গেছেন। যাঁকে আমার বাবা বলে

জানো, তিনি আসলে আমার স্টেপ ফাদার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারিনি। এসব কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। বাবার কথা বলতে গেলেই আমার সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়, সমস্ত জগতের ওপর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। তাই চুপ করেই থাকি।'

—আমরা এতে অসন্তুষ্ট হয়েছি এটাই বা তুমি ভাবছো কেন?

তাড়াতাড়ি বললাম আমি।

রোশেনারা এ-কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, 'রথী, সেদিন আমার ঘরে একটা ফটো দেখেছিলে মনে আছে?'

—হ্যাঁ, আছে।

—উনিই আমার বাবা। মনসুর আলি খাঁ। দবীর খাঁর শেষ বংশধর।

বেবীর কথায় আমি হাঁ হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না।

বেবী নিজেই আবার বলল, 'একদিন তোমাকে সব বলবো। অনেক কিছু বলবার আছে।'

আমরা কেউ আর কোনো কথা বললাম না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম।

। ছয় ।

বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো কেমন জ্বালা করছিল। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। শুভাশিস আর রোশেনারাকে কেন্দ্র করে মনটা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মনের কোণে যেন একটা ঝড় উঠতে চাইছিল। শুভর মার মুখটা বার বার ভেসে উঠছিল মনের পর্দায়।

সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরীই হয়ে গেল। সকালের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সামনে এক কাপ চা নিয়ে খবরের কাগজটা খুলে তখন সবে মাত্র বসেছি। এমন সময় দেখি, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুভাশিস। মুখে এক টুকরো হাসি।

—আরে শুভ! কী ব্যাপার এত সকালে?

ওকে দেখে সোজা হয়ে বসলাম আমি।

—এখন আর সকাল নেই ব্রাদার। সকাল এখন দুপুর হতে চলেছে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে শুভাশিস। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, 'মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলি?'

—হুঁ।

—আজকাল ঘুম থেকে ওঠার সময় বুঝি এই রকম হয়েছে?

—না ঠিক তা নয়। কাল রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি। তাই উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল।

বললাম আমি।

—তার মানে সারা রাত ধরে আকাশ-পাতাল ভেবেছিস?

শুভাশিসের কথায় হেসে বললাম, 'তা একেবারে মিথ্যে বলিস

নি। আজেবাজে অনেক ভাবনাই মাথার ভেতর কিলবিল করছিল। কিছুতেই ঘুমটা আসছিল না।'

শুভাশিস চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে বললে, 'শুনে সুখী হলাম। তোর মস্তিষ্ক তাহলে আগের মতই অকাজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে!'

ওর কথায় একটু হাসলাম আমি। শুভাশিস একটুকাল চুপ করে থেকে ভুরু কুঁচকে বললে, 'তা, তোর ব্যাপার কি বলতো?'

—কিসের ব্যাপার?

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করি আমি।

—এক কাপ চা যে খাওয়াবি সেদিকেও খেয়াল নেই? এদিকে আবার নিজের চা-টাও ঠাণ্ডা করে ফেলছিস!

—বোস বোস চা আনছি।

হাসতে হাসতে উঠে পড়লাম আমি।

চায়ের পাট চুকলে শুভাশিস একটা সিগারেট ধরাল। ওর দিকে চেয়ে বললাম, 'বল্ এবার, সকালে হঠাৎ কি মনে করে?'

—তোকে আজ অফিস ডুব মারতে হবে স্রেফ এই কথাটা বলতেই এলাম।

বেশ নির্বিকার ভাবে বললে শুভাশিস।

—কোন প্রোগ্রাম আছে নাকি?

প্রশ্ন করলাম আমি।

—এখনও কিছু ঠিক করিনি। সে-সব পরে ভেবে-চিন্তে ঠিক করা যাবে। আপাততঃ চুপ চাপ বোস। একটু গল্প করা যাক্। কথাটা শেষ করে চেয়ারে পিঠ দিয়ে খানিকটা সময় নিঃশব্দে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল শুভাশিস। তারপর এক সময় আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আজকাল মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস?'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। শুভাশিস নিজেই আবার বললে, 'আমাদের অজানা এমন কোনো শক্তি আছে

যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।'

আমি অবাক হয়ে শুভাশিসের মুখের দিকে চাইলাম। ওর মুখে এ-ধরণের কথা! হল কি ওর! ভাবলাম মনে মনে।

শুভাশিস একটু থেমে আবার বললে, 'মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যার ওপর তার নিজের কোনো হাতই থাকে না। অথচ সেই সব ঘটনাই হয়তো একজন মানুষের জীবনের সব কিছু একেবারে ওলট পালট করে দেয়। সত্যিকথা বলতে কি, এর কোন ব্যাখ্যাই আমি খুঁজে পাই নি।'

—এগুলো এ্যাকসিডেণ্ট ছাড়া কিছুই নয়। আর মানুষের জীবনে এ্যাকসিডেণ্ট থাকবেই। এ্যাকসিডেণ্টের ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়াই তো বিড়ম্বনা।

ওর কথার উত্তরে বললাম আমি।

শুভাশিস খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে, এ্যাকসিডেণ্ট বললে অবশ্য কিছু বলার থাকে না। মনটা কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে চায়'না। মনে হয়, কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে।'

—ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিস বলে মনে হয়!

একটু বিদ্রূপ করেই বললাম আমি।

আমার কথাটা ও যেন শুনতেই পেল না। কেমন অন্যমনস্ক মনে হল ওকে। একটু কাল চুপ করে থেকে এক সময় বললে, 'আমার নিজের কথাই এক এক সময় ভাবি। ভেবে অবাক হয়ে যাই। কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।'

ওর কথার কোন অর্থই খুঁজে পেলাম না আমি। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

শুভাশিস সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর সেটাকে এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। আমি তখনও ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। শুভাশিস সোজা হয়ে বসে বললে, 'বহরমপুর গিয়ে ঠিক করেছিলাম, রুটিন মাফিক সব কিছু

করব। থিসিসটা কমপ্লিট করতে হলে আরও বেশী পড়াশুনো করা দরকার। তাই যতটা সম্ভব পড়াশুনোয় সময় ব্যয় করা যায় তারই চেষ্টা করছিলাম।'

—তুই রিসার্চ করছিস নাকি?

ওকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—সেই রকমই একটা ইচ্ছে ছিল, তবে সে সব এখন বাতিল হয়ে গেছে।

—কেন?

—হবার নয় বলে। যাক যা বলছিলাম। এদিকে আবার হোসেনদা ওঁদের কাগজে প্রবন্ধ লিখবার জন্য প্রায়ই তাগাদা দেন। মাঝে মাঝে লিখেওছি। এসব লেখার জন্যও পড়াশুনো করা দরকার। ফলে ঠিক করলাম, পড়াশুনো নিয়েই কাটিয়ে দেব। পড়াশুনো নিয়ে কেটেও যাচ্ছিল।

—সেই জন্যই বোধ হয়, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাসনি, পাছে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়।

একটু বিদ্রূপের সুরেই বললাল আমি। শুভাশিস আমার বিদ্রূপটা গায় না মেখেই বললে, 'তা নয়। এটা একটা অদ্ভুত খেয়াল বলতে পারিস। পাগলামী বললেও আপত্তি করব না। সব কিছু থেকে দূরে থাকতে বেশ ভালই লাগত। কলকাতায় মনের ওপর সব সময় যে অদ্ভুত একটা বোঝা চেপে থাকত, বহরমপুরে পড়াশুনো নিয়ে থাকার ফলে মন থেকে সে বোঝাটাও ধীরে ধীরে সরে গেল। মোটামুটি দিনগুলো বেশ ভালই কাটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল।'

—কী-যে হেঁয়ালী করছিস! যা বলবার পরিষ্কার করে বল না।

শুভাশিস চুপ করতেই বললাম আমি। আমার কথায় শুভাশিস একটু হাসল। কয়েকটা মিনিট বসে রইল চুপ চাপ।

তারপর একটু একটু করে অনেক কথা বললো। মনের মধ্যে জমে-থাকা অনেক কথা।

বহরমপুর কলেজে ওর তখন মাস ছয়েক কেটেছে। পড়া আর পড়ান, এই নিয়ে বেশ কাটছে দিনগুলো। মেসের জীবনটাও সহজ হয়ে গেছে। সেদিনটা ছিল কি একটা ছুটির দিন। মেসের বেশীর ভাগ লোকই গেছে বাড়ীতে। বলতে গেলে মেস প্রায় খালি। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে শুভাশিস তখন সবে মাত্র একটা বই হাতে নিয়ে বসেছে, এমন সময় মেসের বাচ্চা চাকরটা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'বাবু এক দিদিমনি আপনাকে ডাইকছে।'

ভুরু কুঁচকে শুভাশিস ছেলেটার দিকে চেয়ে বললে, 'কি করে বুঝলি আমায় ডাকছে?'

—আপনার নাম বইলছে যে। বইলছে শুভবাবু।

ছেলেটি হাত মুখ নেড়ে বোঝাল।

—আমার কাছে কোন দিদিমনি এখন আসতেই পারে না। তুই ভাল করে শুনে আয় তো।

ছেলেটি যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সেই দিদিমনির মুখোমুখি। ছেলেটি কিছু বলবার আগেই দিদিমনি একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে শুভাশিসকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'কেন, তোমার কাছে কোনো দিদিমনি আসতে পারে না কেন?'

দারুণ অবাক হয়ে শুভাশিস ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। অবাক চোখে চেয়েই বললে, 'বেবী তুমি! এমন অসময়ে?'

রোশেনারা নিজেই একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'এই এলাম।'

শুভাশিস একটু হেসে বললে, 'এলে যে সে-তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ এ-ভাবে এলে, ব্যাপার কি? এখানে অন্য কোথাও এসেছো নাকি?'

—কোথায় আর আসব? সোজা তোমার এখানেই আসছি।

রোশেনারার কথায় এবার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল শুভাশিস। বললে, 'বলো কি, সেই কলকাতা থেকে সোজা এখানে আসছো? তাহলে তো খাওয়াও হয় নি। দাঁড়াও দাঁড়াও আগে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করি।'

তখনও দাঁড়িয়ে ছিল বাচ্চা ছেলেটা। শুভাশিস তাকে ডেকে খাবারের কথা বলতেই বাধা দিয়ে উঠল রোশেনারা। বললে, 'তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আসবার সময় ভাত খেয়েই আসতে পেরেছি, তুমি বরং এক গ্লাস জল খাওয়াও।'

অগত্যা ছেলেটিকে যেতে বললে শুভাশিস। তারপর কুঁজো থেকে নিজেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলে।

পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে গ্লাসটা রাখতে রাখতে বললে রোশেনারা, 'বড় তৃপ্তি দিলে শুভ।' তারপর আঁচল দিয়ে গলার ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'তারপর তুমি কেমন আছ বলো!'

—কেমন দেখছো?

মুচকি হাসল শুভাশিস।

—ওপর থেকে আর কতটুকু বোঝা যায়?

—যতটুকু যায় ততটুকুই বলো।

—সেটুকু বলতে গেলে বলতে হয়, বেশ ভালই আছ।

—তাহলে তাই।

ছোট্ট করে উত্তর দিলে শুভাশিস। তারপর একটু থেমে, রোশেনারার চোখের দিকে কয়েকটা সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বললে, 'আর তুমি? তুমি কেমন আছ?'

শুভাশিসের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কোনো উত্তর দিতে পারলে

না রোশেনারা। শুভাশিসের প্রশ্নে একটা চাপা অভিমান যেন ওর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল ওর। নিজেকে আড়াল করবার জন্য শুভাশিসের চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিলে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রোশেনারার দিকে চেয়ে শুভাশিসের বুকের ভেতরটাও যেন কেমন তোলপাড় করে উঠল। কী এক অনাস্বাদিত অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরল। মাথার ভেতর কী এক যন্ত্রণা অনুভব করল সে।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর রোশেনারা মুখ ফিরিয়ে শুভাশিসের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি কেমন আছি, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। যে-প্রশ্নের উত্তর তুমি মন থেকে জানতে চাইছো না তার জবাব আমি দেব না। দিতে পারি না।'

রোশেনারার গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিল সে।

সেই মুহূর্তে শুভাশিসের কেমন যেন মনে হল, সে রিক্ত, নিঃস্ব। মনে হল, নিজের অজান্তে কখন যেন তার একান্ত আপনার জিনিষটা হারিয়ে গেছে। রোশেনারার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শুভাশিস। তারপর আকুল ভাবে বলে উঠল, 'বিশ্বাস করো, বেবী, সাত্যিই আমি মন থেকে জানতে চাইছি। তোমার সব কথা জানতে ইচ্ছে করছে। বলো সব বলো।'

রোশেনারা চমকে শুভাশিসের মুখের দিকে চাইল। শুভাশিসের গলায় এমন আকুতি আর কখনও শোনেনি সে। কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

—আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না?

শুভাশিসের গলার স্বরে কাতরোক্তি।

শুভাশিসের কথাগুলো বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল রোশেনারার। ভালোও লাগছিল। কী বলবে ভেবে পেল না রোশেনারা।

একটু হাসতে চেষ্টা করল, হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইল নিজেকে। কিন্তু হাসতে গিয়েই দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'কী বিচ্ছিরি বলো তো? কথা নেই বার্তা নেই, চোখ দিয়ে হঠাৎ জল পড়তে শুরু করল। কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে বলো তো? কী বিচ্ছিরি!'

শুভাশিস কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে ওর দিকে চেয়েই রইল।

'বা-রে, তুমি বুঝি চেয়ে চেয়ে মজা দেখবে?' কেমন আদুরে মেয়ের মত ঘাড় দুলিয়ে বলতে লাগল রোশেনারা। 'তোমার ঘরে তো আর একটা বেড দেখছি সত্যিই যদি কেউ এসে পড়ে?'

—না কেউ আসবে না। ছুটিতে সবাই বাড়ি গেছে।

শুভাশিসের গলাটা কেমন থমথমে মনে হল।

—তা হলেও......মানে......তুমিই বা কি ভাবছো। হয়তো ভাবছো, মেয়েটা কী-রে বাবা, এসেই নাকে কাঁদতে শুরু করে দিল। সত্যিই ভারী বিচ্ছিরি! বলো, বিচ্ছিরি কিনা?

এবার হেসে ফেলল শুভাশিস। বেশ সহজ ভাবেই হাসল। হেসে বললে, 'আজকাল তাহলে বেশ ফরমাল হয়েছো। একটু উন্নতি হয়েছে তাহলে?'

শুভাশিসের হাসিতে রোশেনারও হাসল। অনেকটা সহজ মনে হল ওকে।

শুভাশিস এবার দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি একটু বসো, আমি একবার চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। তোমার তো এখন প্রয়োজনই, তাছাড়া আমার মনটাও বড্ড চা-চা করছে।'

রোশেনারা কিছু বলবার আগেই শুভাশিস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে ফিরতে ওর একটু দেরীই হয়ে গেল।

শুভাশিস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রোশেনারা গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। সামনে ভাগীরথী। সেই দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিস্তব্ধ দুপুর, কোথাও কোন সাড়া নেই। ভাগীরথীকে ছবির মত মনে হচ্ছে। গ্রীষ্মের শীর্ণকায় নদী কোনো রকমে যেন নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওপারে কেবল বালি আর বালি। এদিকে চারপাশে অসংখ্য গাছের সারি। গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, গাছের পাতায় যেন ঝিম ধরেছে। দূরে রোদের দিকে চাইলে কেমন নেশা ধরে যায়। রোশেনারা ক্লান্ত চোখ মেলে চারিদিকে দেখছিল। দূর থেকে কোন নিঃসঙ্গ ঘুঘুর ডাক কানে ভেসে আসছিল। ঘুঘুর সেই ডাক শুনতে শুনতে রোশেনারার মনটাও যেন হারিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সব যেন ভুলে গেল সে।

শুভাশিস যখন ফিরে এল রোশেনারা তখনও তেমনি করেই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। রোশেনারাকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুভাশিসের হঠাৎ যেন কেমন মনে হল, রোশেনারার অন্য কোন পরিচয় নেই, ওর একটাই মাত্র পরিচয়,—ও নারী। আর কোন পরিচয় ওর নেই, আর কোন পরিচয় ওর থাকতে পারে না। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ-খ্রীশ্চিয়ান কিছুই নয়, নারীত্বই ওর একমাত্র পরিচয়।

শুভাশিসের মন বলতে লাগল, 'তোমার সামনে ঐ যে মূর্তীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মৃদু হাওয়ায় যার চুল উড়ছে, কাঁধ থেকে খসে-পড়া আঁচল দুলছে একটু একটু, দৃষ্টি যার প্রসারিত দূরে অনেক দূরে, এই রোদ-ঝলসানো দুপুরে যে কেবল তোমারই কাছে ছুটে এসেছে, সে আর কেউ নয়, সে এক নারী। চিরন্তনী প্রকৃতি। আর তুমি নিজে চিরকালের পুরুষ। তোমাদের জাত নেই, ধর্ম নেই, পৃথক কোন পরিচয় নেই। পুরুষ আর প্রকৃতি—এটাই তোমাদের একমাত্র পরিচয়। বাকী সমস্ত পরিচয়ই মিথ্যে।'

এমনি ভাবনায় দুলতে দুলতে শুভাশিসের মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে? তাহলে কিসের এত দ্বিধা? কিসের জন্য প্রতি মুহূর্তের এত মানষিক দ্বন্দ্ব? তাহলে কিসের জন্য সে নিজের কাছ থেকে এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? তাদের অন্য সব পরিচয় যদি মিথ্যেই তবে কেন এমন করে নিজেকে ঠকাচ্ছে তারা?

সেই ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুরে শুভাশিসের সমস্ত চেতনা যেন চিৎকার করে বলতে চাইল, 'বেবী, তোমায় আমি ভালবাসি। আমি একান্ত করে তোমাকে পেতে চাই।'

শুভাশিসের মুখ দিয়ে কিন্তু কোন কথা বেরোল না। কেবল নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে রোশেনারার কাঁধে একটা হাত রাখল সে।

চমকে ফিরে চাইল রোশেনারা। শুভাশিসকে দেখে আশ্বস্থ হয়ে বললে, 'ও তুমি?'

—হুঁ।

ছোট করে উত্তর দিলে শুভাশিস। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার মত মনের অবস্থা তখন নয়।

রোশেনারা শুভাশিসের চোখের দিকে চেয়ে অবাক হল। দেখতে পেল, সেখানে এক বিরাট ঝড়ের ইঙ্গিত। সে ঝড় বুঝি আসন্ন। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, ভেতরের সেই ঝড় এখনই প্রচণ্ড বেগে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর সেই প্রচণ্ড বেগের সামনে সে বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। সে হারিয়ে যাবে, তার অতীত-বর্তমান কোথায় যাবে ভেসে। শুভাশিসের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে ওর ভয় হল। বুকটা কোন অজানা আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। আপনা হতেই চোখ দুটো বুজে এল ওর।

এক-দুই-তিন করে কয়েকটা সেকেণ্ড কাটল। কিন্তু না, ঝড় উঠল না। রোশেনারার কাঁধের ওপর শুভাশিসের হাতটা যেমন ভাবে ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে রইল।

রোশেনারা মুখ ফিরিয়ে নিলে। কোনো কথা না বলে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে আবার। শুভাশিস তখনও চুপ। রোশেনারাও চুপ করে রইল। বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় দূরে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'শুভ, নদীর ধারে ঐ যে মাটির ঢিবিটা, বড় গাছগুলো যেখানে ছোয়া ফেলেছে, যাবে ওখানে ? চলো না যাই। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে থাকতে বেশ লাগবে।'

রোশেনারার গলায় কেমন আবদারের সুর।

শুভাশিস এতক্ষণে যেন নিজেকে ফিরে পেল। অনেকখানি সহজ হল সে। রোশেনারার কথার উত্তরে বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'কিন্তু পথটা তো কম নয়। রোদে এতটা পথ যেতে ভাল লাগবে ?'

—খুব লাগবে। চলো না তুমি।

—তাহলে একটু অপেক্ষা কর, চা আনতে বলেছি। চা খেয়েই বেরোনো যাবে।

রোশেনারা যেন খুশিতে উপচে পড়ল।

চা খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা। শুভাশিস ঠিকই বলেছিল, অনেকখানি পথ। রোদের মধ্যে অতটা পথ হেঁটে ক্লান্তই হয়ে পড়েছিল রোশেনারা। ঢিবিটার কাছে এসে গাছের নীচে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ধপ করে বসে বললে, 'আঃ এতটা পথ কষ্ট করে আসাটা যেন সার্থক হল। বেশ জায়গাটি।'

শুভাশিস বসল ওর সামনে। দুজনে বসলো মুখোমুখি। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। লোকজন নেই বললেই হয়। রোশেনারা চারপাশটা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। খুব ভাল লাগছিল ওর। এখানে ওখানে অনেকগুলো বড় গাছ। আম গাছই বেশী। অন্য গাছও আছে। সবাই মিলে ঘন ছায়ার সৃষ্টি করেছে। খানিকটা দূরেই আবার ছোট ছোট গাছের ঝোপ-ঝাড়।

সেখানে ফড়িং প্রজাপতির মেলা। কী একটা ফুলেব মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সামনে পায়ে চলা সরু পথ। সে পথটা গাছের আড়ালে-আবডালে চলতে চলতে দূরে গিয়ে হারিয়ে গেছে। কতদূর চলে গেছে সে পথ কে জানে! চারিদিকে চেয়ে দেখতে খুব ভাল লাগছিল রোশেনাবার। কেমন একটা উদাস ভাব যেন ঘিরে ধরতে চাইছিল ওর মনটাকে।

নদীর ঠিক ধারেই বসেছিল ওরা। যেখানে বসেছিল সেখানে নদীর পারটা অনেকটা খাড়াই। অনেকটা নীচে নদীর জল। সেই জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে রোশেনারা বললে, 'ভাগীবথীকে দেখে কেমন শান্ত মনে হচ্ছে তাই না? মনে হচ্ছে কিছুই বুঝি সে জানে না। অথচ গ্যাখো এই ভাগীরথীই ইতিহাসের কত ঘটনাব নীরব সাক্ষী! কত উত্থান-পতনই না সে দেখেছে। কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কিছুতেই তার যেন বিকার নেই।'

জলের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে শুভাশিসের মুখের দিকে চাইল রোশেনারা। ওব চোখে কেমন এক তন্ময়তার ভাব। একটু থেমে বললে, 'ভাগীরথীব বুকে কান পাতলে বোধহয় গোটা বাঙালী জাতির ইতিহাসই শুনতে পাওয়া যায়। একটা নদীই যেন একটা জাতির ইতিহাস। সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়।'

শুভাশিস কোনো উত্তর দিলে না, নিঃশব্দে রোশেনারার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একটু চুপ করে রোশেনারা আবার বললে, 'এই ভাগীরথীকে নিয়ে আমাদের কম গর্ব নয়। আবার তার ওপর অভিমান করবারও যথেষ্ট কারণ আছে।'

রোশেনারার কথার অর্থটা ঠিক যেন ধরতে পারল না শুভাশিস। ভুরু-কুঁচকে চাইল ওর দিকে। রোশেনারা নিজেই ওর কথাটা পরিষ্কার করে বললে, 'এই ভাগীরথী তথা গঙ্গা বাংলাকে-

যেমন অকৃপণ হাতে ঐশ্বর্য দিয়েছে, তেমনি আবার তার শত্রুকেও কাছে টেনে এনেছে, আদর করে বুকে স্থান দিয়েছে। ভাবতে গেলে অভিমান হয় কিনা বলো ?'

শীর্ণকায়া ভাগীরথীর দিকে শুভাশিস চেয়ে রইল একটুকাল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'শত্রুরও কিন্তু প্রয়োজন আছে। শত্রুও অনেক সময় মিত্রের কাজই করে। বিশেষ করে একটা জাতির ক্ষেত্রে তো বটেই।'

—তার মানে ?

একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলতে চলতে শুভাশিসের কথায় হঠাৎ যেন হোঁচট খেল রোশেনারা। চোখ দুটো সূক্ষ্ম করে শুভাশিসের দিকে চাইল।

রোশেনারার প্রশ্নের উত্তরে শুভাশিস ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'বাইরের শত্রুরা যখন একটা দেশে আসে, সেই দেশকে শাসন করার ইচ্ছে নিয়ে, তখন তারা একেবারে শুধু হাতে আসে না। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে সে-দেশের সভ্যতার আলোও। ইতিহাসের দিকে চাইলেই সে কথার অর্থ বুঝতে পারবে। এ কথা ঠিক তো যে, আমাদের সমাজ একটা সময়ে একেবারে স্ট্যাগনান্ট হয়ে গিয়েছিল। স্রোতহীন জলাশয়ের মত। বলতে গেলে তখন তার পচনশীল অবস্থা। সেই সময় ঘটল মুসলমান জাতির আগমন। মুসলমান আক্রমনের সাথে এলো মুসলমান সভ্যতাও। এই সভ্যতার আলোয় নতুন করে বেঁচে উঠল এ-দেশের সমাজ। তার জীবনে আবার গতি এলো। একদিন আবার এই গতিও ব্যাহত হল তখন এ-দেশে মুসলিম শাসনের অন্তিম দশা। মুসলিম শাসকদের এই অন্তিম দশায় এল ইংরেজ। ইংরেজ সভ্যতার আলোয় ধীরে ধীরে আলোকিত হল গোটা ভারতবর্ষ। এমনি করেই একবার আলো নিভেছে আবার জ্বলেছে। তাহলেই বলো, এই সব শত্রুরা পরোক্ষে মিত্রের কাজ করেনি কি ?'

—তা বটে।

শুভাশিস রোশেনারার মুখের দিকে চেয়ে এবার একটু হেসে বললে, 'তা' এখানে বসে এই সব দার্শনিক আলোচনাই চলবে, না অন্য কিছু কথা-বার্তাও হবে?'

—অন্য কিছু আলোচনা করতে হলে তো প্রথমেই তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করতে হয়।

মুখ টিপে হাসল রোশেনারা।

—কেন?

—নয় তো কি? আমি এতগুলো চিঠি দিলাম, আর তুমি কিনা তার জবাবে একটা মাত্র চিঠি দিয়েই চুপ। একটা চিঠিতেই একেবারে ইতি টেনে দিলে। এমন লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করতে গেলেই তো কথা বন্ধ করতে হয়। বলো, বন্ধ করতে হয় কিনা?

বেশ হালকা ভাবেই কথাগুলো বললে রোশেনারা। ওর মুখে রাগ বা অভিমানের কোনো অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেল না।

রোশেনারার কথায় শুভাশিস কিন্তু একটু অস্বস্তিই বোধ করল। কতকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই বললে, 'সেই চিঠিটাতে আমি যে কথা লিখেছিলাম, সেটা কিন্তু সত্যিই আমার মনের কথা। বিশ্বাস করো, চিঠি লিখতে আমার ইচ্ছেই করে না। লিখতেও যদি বসি তাহলেও সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। যা বলতে চাই তা' যেন বলা হয় না। বরং লেখার চেয়ে যাকে লিখছি তার কথা ভাবতেই বেশী ভালো লাগে। সত্যি কথাই বলছি, এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না।'

শুভাশিসের কথা শেষ হতেই রোশেনারা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে হাসল।

—হাসছো কেন?

প্রশ্ন করল শুভাশিস।

—তোমার মত আমিও যদি ঐ কথা বলি তাহলে কেমন হয় ?

—তাহলে বুঝবো, তুমি তোমার মনের কথা বলছো না।

—বা-রে, বেশ মজা তো। নিজের বেলায়—।

ছেলেমানুষের মতই কথাটা বললে রোশেনারা।

—ঐটুকু মজা না হয় আমার জন্য রইলই! কি বলো ?

হেসে উত্তর দিলে শুভাশিস।

রোশেনারা এর কোনো প্রতিবাদ করল না।

কাছেই একটি শুকনো ডালে বসে একটা কাঠ-ঠোকরা ক্রমাগত ঠুকরে যাচ্ছিল,—ঠক-ঠক-ঠক। রোশেনারা মুখ ফিরিয়ে সেই দিকে চাইল। একমনে দেখতে লাগল পাখীটাকে। পাখীটার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। শুভাশিসও চুপ করেই রইল।

নিঃশব্দে বেশ খানিকটা সময় কাটবার পর রোশেনারা পাখীটার দিকে চেয়েই বললে, 'আজকাল কি-যে হয়েছে, কিছুই যেন ভাল লাগেনা। যখনই একা থাকি তখনই মনে হয়, কে যেন মাথার ভেতরে সমানে হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। আজকাল তাই একা থাকতেই ভয় হয়।'

শুভাশিস কোন সাড়া দিল না। কাঠ ঠোকরাটা শুকনো ডালে বসে তখনও সমানে ঠুকরে চলেছে—ঠক-ঠক-ঠক। রোশেনারা সেই দিকে চেয়েই আবার বললে, 'হাতুড়ি পেটান বললে ঠিক বলা হয়না। ঠিক হাতুড়ি পেটান নয়, এ যেন কাঠঠোকরার ঠোকরানো। যখন একা বসে থাকি তখন মনে হয়, একটা কাঠঠোকরা যেন সমানে মাথার ভেতর ঠুকরে চলেছে।'

একটু থেমে শুভাশিসের দিকে চেয়ে বললে, 'কেন যে এমন হয় বুঝিনা।' রোশেনারার গলায় একটা অসহায়ের ভাব ফুটে উঠল।

শুভাশিস রোশেনারার চোখের দিকে চেয়ে রইল একটুকাল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আমার কি মনে হয় জান?'

—কি?

—আমার মনে হয়, তুমি তোমার মনের ভেতরে কোনো কিছু গোপন রাখতে চেষ্টা করছো। এমন একটা কিছু যা তোমার অবচেতন মন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

রোশেনারা কোন উত্তর দিলে না। গঙ্গার ওপারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। খুব অন্যমনস্ক মনে হল ওকে। কয়েকটা মিনিট চুপচাপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে শুভাশিসের মুখের দিকে চাইল। ওর চোখ দুটো তখন ছল ছল করছে। আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'তুমি ঠিকই বলেছো শুভ, একটা ভয়ঙ্কর সত্যকে মনের ভেতরে গোপন রাখবার চেষ্টা করছি। আজ নয়, অনেক দিন থেকেই এ-চেষ্টা চলেছে। কিন্তু কিছু দিন হল, মনটা বিদ্রোহ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আর বোধ হয় নিজেকে সংযত রাখতে পারব না। একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবো। ভয়ানক কিছু ঘটে যাবে।'

রোশেনারা আঁচল দিয়ে ওর চোখদুটো মুছে নিলে। শুভাশিস রোশেনারার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর কথা ঠিক যেন বুঝতে পারল না।

রোশেনারা চোখ দুটো মুছে নিয়ে শুভাশিসের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বললে, 'মনের সব কথা তোমায় খুলে বলবো বলেই এখানে এসেছি। একটা ভয়ঙ্কর সত্যকে এতকাল পুষে রেখেছি। কিন্তু আর যেন পারছি না।'

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলে চলল, 'বাবার কথা তোমাদের আমি কিছুই বলিনি। বলতে পারিনি। বাবার কথা বলতে গেলে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে ওঠে। তাই বাবার প্রসঙ্গ যতটা সম্ভব এড়িয়েই গিয়েছি। কিন্তু আর যেন পারছি না।'

একটু থেমে শুভাশিসের দিকে মুখ না ফিরিয়েই খুব আস্তে শুভকে ডাকল, 'শুভ !'

—উঁ।

—দবীর খাঁর কথা তোমার মনে আছে ?

—আছে।

—বাবা একদিন এই দবীর খাঁর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বড়ই দুঃখের কথা মা, এত বড় মহাপুরুষের বংশে জন্মেও কিছুই করতে পারলাম না। এই মহাপুরুষ বলেছেন, ধর্মে-ধর্মে যে ভেদ রয়েছে মানুষকে তার উর্দ্ধে উঠতে হবে, নইলে কিছুই হবে না। সত্যি কিছুই হল না। কেবল গোঁড়ামির আবর্তেই পড়ে রইলাম। আসলে এদের সঙ্গে মিশে বাঙালীত্ব হারাতে বসেছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা চুপ করে গিয়েছিলেন। সেদিন বাবার কথার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ তাঁর কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি। বুঝলে, শুভ, আজ অনেক কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার।

ধীরে ধীরে অনেক কিছুই বলেছিল রোশেনারা। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করেছিল সে।

রোশেনারার পিতা মনসুর আলি খাঁ ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। কবি প্রকৃতির। মনের দিক দিয়ে ছিলেন খাঁটি বাঙালী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার শেষ ধাপ পেরোবার পর মোটামুটি একটা উঁচু সরকারী পদ পেয়ে যান মনসুর আলি খাঁ। চাকরির সুবাদেই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত তাঁকে। গ্রামে ঘুরতে বেশ লাগত মনসুর আলির। গ্রামের নদী-নালা, মাঠ-ঘাটের মধ্যে যেন বাংলার প্রাণের সাড়া খুঁজে পেতেন। আনন্দে ভরে উঠত মনসুর আলির মন।

এমনি করে বেশ কাটছিল। একটা মুক্ত জীবন। কিন্তু তাঁর সে-আনন্দে বাদ সাধলেন মনসুরের আব্বাজান। বিয়ের জন্য

পীড়াপীড়ি শুরু করলেন তিনি। এদিকে মায়ের মুখেও উঠতে বসতে ঐ একই কথা। কাজেই শেষ পর্যন্ত বিয়েতে মত দিতে হল মনসুর আলিকে। মায়ের পছন্দ মত মেয়েও মিলল। বড় ঘর, বড় বংশ খাস ইরাকের মানুষ তারা। মাত্র চার-পাঁচ পুরুষ হল বাংলা দেশে বাস করছে। তাইগ্রীস-ইউফ্রেতিশ নদীর জল যেন আজও তাদের দেহ থেকে শুকোয়নি, খাল-বিল-নদী-নালাব এই দেশটাকে আজও তারা আপন বলে ভাবতে পারেনি, আপন বলে ভাবতে চাও না। অবশ্য সময়ের ব্যবধানে ভাষাব পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সাজ-পোষাক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিন্তু মনের দিক দিয়ে আজও তারা ইরান-তুরানেরই অধিবাসী।

মেয়েটিও সুন্দরী। নাম সালেমা। অদ্ভুত তাব গায়ের রঙ। বস্‌রার গোলাপের ওপর যেন বাংলার শ্যামলা রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। মনসুর আলির মা বাবার খুব পছন্দ, যেমন মেয়েকে দেখতে, তেমনি বংশ। মনসুর আলির মনটা কিন্তু কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তাঁব কেবলই মনে হতে থাকে, ঐ বংশের মেয়ের সাথে তার মিলবে না, ভবিষ্যতে অশান্তি হতে পাবে। তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে, যে বাড়ীব লোকেরা এই বাংলা দেশটাকে আপন বলে ভাবতেই পারে না, বাঙালী হওয়াটা যাদের কাছে প্রায় অপমান জনক, তারা তার আপনজন হবে কি করে? মনসুর আলির মনের ভেতরটা যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। কিন্তু মার ইচ্ছের কাছে ছেলের অনিচ্ছে টিঁকল না। দেন-মোহরের কথা পাকা হল। সাক্ষীদের সামনে মেয়ের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে বিয়ের পালা চুকল। ঘরে এলো নব-বধূ।

দিনগুলো কাটতে লাগল একরকম ভাবে। সরকারী কাজে মনসুর আলিকে ট্যুরে বেরোতে হয়, তখন সালেমা বেগমকে থাকতে হয় একা। কতকটা নিঃসঙ্গ বোধ করে সালেমা। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে কত আর গল্প করা যায়। দ্বিতীয় আর কোন

লোক নেই যার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করা যেতে পারে। কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে সালেমা বেগম। এদিকে মনসুর আলি যখন বাড়িতে থাকে তখন তাঁর কাগজ-পত্র বই খাতা নিয়েই কেটে যায়। মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেন কাব্য-সাহিত্য নিয়ে, বাংলা দেশের ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু এ সব ভালো লাগে না সালেমার। সে চায় হালকা আমেজের মধ্যে দিন কাটাতে, হৈ চৈ করে মেতে থাকতে। মনটা তাই বিরক্তিতে ভরে উঠতে থাকে ক্রমশ।

এমনি করেই পাঁচ-ছয়টা বছর কাটল। ইতিমধ্যে সালেমার কোলে একটি মেয়ে এসেছে। মনসুর আলির নয়নের মনি। মেয়েকে আদর করে ডাকেন, বেবী, পোষাকী নাম রেখেছেন রোশেনারা।

মেয়েকে নিয়ে মাতামাতি করে বেশ কিছুদিন কাটে সালেমার। মেয়েকে খাওয়ায়, মেয়েকে সাজায়, মেয়েকে নানা ভাবে আদর করে। মেয়েকে নিয়েই দিন চলে যায় তার। কিন্তু মেয়েও ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল, মায়ের কোল ছাড়ল। মায়ের চেয়ে দাদা-দাদীর কাছে থাকতে পেলেই এখন সে আরও খুশি। বাবাকে পেলে আর কারো কাছেই যেতে রাজী নয়। সালেমা যেন আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

তারপর একটু একটু করে আরও অনেকগুলো দিন কাটল। মনসুর আলির পিতা-মাতা ইতিমধ্যে গত হয়েছেন। সংসারের কর্ত্রী হয়েছেন সালেমা বেগম। রোশেনারা তখন স্কুলের গণ্ডীতে পা দিয়েছে। মনসুর আলি তাঁর লেখাপড়া আর কাজকর্ম নিয়ে যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন। নিঃসঙ্গ সালেমা বেগম মনে মনে অসহায়। এমনি সময় ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল জহিরুলের। জহিরুল সালেমার বাল্যসাথী, ওর মামাতো ভাই। ওকে পেয়ে সালেমা যেন নতুন করে বেঁচে উঠল। ওর জীবনের

মরা নদীতে বান ডাকল।

জহিরুল আসে, মা-মেয়েকে নিয়ে সিনেমা রেষ্টুরেণ্টে যায়। বেড়াতে যায় এখানে সেখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হৈ হৈ করে কাটায়। মনসুর আলি যখন বাড়িতে থাকেন তখন তাকে ডেকে জহিরুল বলে, 'চলো না, ভাইজান, আমাদের সাথে তুমিও চলো।' মনসুর আলি সে আহ্বান কৌশলে এড়িয়ে যান, কারণ তিনি জানেন, তাঁর যাওয়া সালেমার কাম্য নয়।

ছোট্ট মেয়ে রোশেনারা। তার কিন্তু ভাল লাগে না জহিরুল মামুকে। জহিরুলের উপস্থিতিতে সে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। লোকটাকে কোনো ক্রমেই সহ্য করতে পারে না, ওই যে মার গায়ে-ঘেঁষে বসা, মার থুত্নি ধরে আদর করা, এসব তার কাছে অসহ্য লাগে। ছোট্ট মেয়ে, কিছুই বোঝে না, তবু জহিরুলের ওপর প্রচণ্ড রাগে এক এক সময় ফেটে পড়তে চায় তার মন। এক এক সময় মনে হয়, ওর ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে জহিরুলের গলাটা টিপে ধরে। কিন্তু মায়ের ভয়ে কিছুই করতে পারে না, কেমন গুম্ হয়ে থাকে তাই।

রোশেনারার ভাব-ভঙ্গী দেখে জহিরুল এক এক সময় বলে, 'তোমার মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা কিন্তু ভাল হচ্ছে না সালেমা।'

—হ্যাঁ, ওর আব্বাজানের মত বিচ্ছিরি স্বভাব। কেমন এক গুঁয়ে।

যেন একটু চিন্তিত ভাবেই উত্তর দেয় সালেমা।

আর এক দিন। আর এক দিন এমনি একটা কথার উত্তরে সালেমা একটু মুচকি হেসে বলেছিল. 'ভয় নেই, জহিরুল, তুমি যখন ওর আব্বাজান হবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এ কথার অর্থ ছোট্ট মেয়েটি কি বুঝল সেই জানে। কিন্তু সালেমার কথা শেষ হতে না হতেই চিৎকার করে কেঁদে ফেললে সে। ছুটে গিয়ে মার একটা হাত প্রাণপণে কামড়ে ধরল।

ঘটনাটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সালেমা। ঘটনাটা যেমনি অস্বাভাবিক তেমনি আকস্মিক। মেয়ের কামড়ের যন্ত্রণায় সালেমা বেগম পড়েই যাচ্ছিল। পেছন থেকে জহিরুল ধরে ফেলায় সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু তারপরই রাগে একেবারে ফেটে পড়ল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ের চুল ধরে প্রচণ্ড মারতে শুরু করল। মারতে মারতে নিজের হাতেই যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল তার। মেয়ের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তবু মার থামে না। রাগ পড়তে চায় না সালেমার।

কিন্তু সেই শেষ। এরপর আর কোন দিন রোশেনারাকে নিয়ে বেড়াতে যায়নি ওরা। বলতে গেলে এর পর থেকে মা মেয়ের সম্পর্কে একটা বিরাট চিড় ধরে গিয়েছিল। রোশেনারার মনে মায়ের সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। একটা নিদারুণ ঘৃণা ধীরে ধীরে যেন ওর মনটাকে গ্রাস করে ফেলল। মনে মনে কেমন অসহায় হয়ে পড়ল রোশেনারা।

এই ঘটনার প্রায় দিন সাতেক পর ট্যুর সেরে বাড়ি ফিরলেন মনসুর আলি খাঁ। বাবাকে কাছে পেয়ে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল রোশেনারা কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ জানাল না। মনসুর আলি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কি মা, কি হয়েছে তোমার?'

বাবার বুকে মুখ রেখেই ধীরে ধীরে বললে রোশেনারা, 'আব্বা, তুমি আর বাইরে যাবে না, কোনো দিন না। তুমি বাইরে গেলে আমার ভাল লাগে না।'

মনসুর আলি মেয়ের মাথায় চুমো খেয়ে আদর করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি আমার সোনা মেয়ে, তুমি আমার মিষ্টি মেয়ে, তুমি আমার পাগলী মেয়ে। তোমায় ছেড়ে কোত্থাও যাব না, কক্ষনো না।'

তবু বাইরে যেতে হয়েছে মনসুর আলিকে। বার বার যেতে

হয়েছে। ছোট্ট রোশেনারাও জানত, আব্বাকে বাইরে যেতেই হবে, না গিয়ে তাঁর উপায় নেই। এ-নিয়ে তাই আর কোন নালিশও জানায়নি। কিন্তু রোশেনারা ধীরে ধীরে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। কারও সঙ্গে মিশতে পারে না, মন খুলে কথা বলতে পারে না কারও সঙ্গে। খেলা ধুলোয় মন দিতে পারে না। কী একটা বোঝা যেন সব সময় ওর বুকের ওপর চেপে বসে থাকে।

এমনি করেই দিন যায়। একটু একটু করে বড হয়ে ওঠে রোশেনারা। জহিরুল আর সালেমার সম্পর্কটা এখন তার কাছে অনেক স্পষ্ট। সবই বোঝে সে। কিন্তু সালেমার কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। দুর্বার গতিতে একটা বিশেষ দিকেই সে ছুটছে।

এদিকে জহিরুলও যেন দিন দিন কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। সে যেন আর অপেক্ষা করতে পারছিল না।

একদিন সালেমা আর জহিরুল তখন ঘরে বসে কথা-বার্তা বলছে। ঘরের বাইরে থেকে হঠাৎ ওদের টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা শুনে ফেলল রোশেনারা। জহিরুল অসহিষ্ণু ভাবে তখন বলছিল, 'সালেমা আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছি না। একটা কিছু করো। মনে মনে আমি যে একেবারে খতম হয়ে যাচ্ছি।'

উত্তরে সালেমার করুণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'আর কটা দিন অপেক্ষা করো জহিরুল। এর মধ্যে জরুর কিছু করতে পারব।'

সালেমার কথা শুনে রোশেনারার বুকটা কেঁপে উঠল। স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারল না, তবু বাবার কথাটা ভেবেই ভয়ে সে এতটুকু হয়ে গেল।

মনস্থুর আলিও হয়তো কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। বাইরের কোনো ঘটনা নয়, তাঁর অন্তরই হয়তো তাঁকে সজাগ করতে চেয়েছিল। আর হয়তো তাই কিছুদিন থেকেই কেমন মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কোনো কিছুতেই যেন মন দিতে পারছিলেন

না। যখন বাড়ি থাকতেন তখন সব সময়ই মেয়েকে কাছে কাছে রাখতেন। এক এক দিন মেয়েকে কাছে নিয়ে অনেক গল্প করতেন। এমনি একদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন, 'বেবী মা, প্রভু হসান-হোসেনের কাহিনী তো তোমায় বলেছি, তোমার মনে আছে সব ?'

—হ্যাঁ আব্বা, সব মনে আছে।

ঘাড় দুলিয়ে উত্তর দিলে রোশেনারা। তারপর নিজেই আবর বললে, 'প্রভু হাসানের এক স্ত্রী এজিদের মোহে পড়ে নিজের স্বামীকেই বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিল, তাই না আব্বা ?'

—হুঁ।

কেমন অন্যমনস্কের মত উত্তর দিলেন মনসুর আলি।

—কী সাংঘাতিক! তাই না আব্বা ?—চোখ বড় বড় করে বলে রোশেনারা।

—হ্যাঁ মা, সাংঘাতিক। ভাবলে অবাক হতে হয়, মানুষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

একটু থেমে বললেন, 'মানুষের মত দেহ হলেই মানুষ হওয়া যায় না মা। মানুষের মত যাদের দেহ তারা বরং সহজেই পশু হতে পারে, কিন্তু সহজেই মানুষ হতে পারে না। পশু হওয়ার জন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না, পশু জন্ম থেকেই পশু। কিন্তু মানুষ জন্মেই মানুষ হয় না। মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য অনেক ধৈর্য্য ধরতে হয়, অনেক পরিশ্রম করতে হয়'

কথা বলতে বলতে হঠাতই চুপ করে গেলেন মনসুর আলি। গলাটা যেন বুজে এল। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। রোশেনারা কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। ও যেন স্পষ্ট অনুভব করল, বাবার বুকের ভেতরটায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বাবার কষ্ট দেখে ওর চোখে জল এসে গেল। বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আব্বা, তোমার কষ্ট হচ্ছে ?'

মনসুর আলি মেয়ের মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলেন। চোখ দুটো তাঁর লাল। মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তবু হেসে বললেন, 'দূর বোকা, কষ্ট আবার কিসের রে? খোদাতালা এমন মেয়ে যার ঘরে দিয়েছেন তার আবার কষ্ট কোথায়? কিছু কষ্ট নেই আমার, কিচ্ছু কষ্ট নেই।'

মেয়ের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে মাথায় চুমো খেলেন বার বার।

রোশেনারা বাবার বুকে মাথা রেখে চুপ করে রইল। একটা কথাও বলল না। কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, কী একটা জিনিষ যেন আব্বা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারল না, কী সেই জিনিষ। এর অনেকদিন পরে অবশ্য রোশেনারা সবই বুঝতে পেরেছিল। সেদিন কিন্তু মনসুর আলি ভালো-মন্দের অনেক উর্দ্ধে চলে গেছেন।

মনসুর আলি যখন একা বসে থাকতেন, তখন প্রায়ই কয়েকটা ইংরেজী লাইন আবৃত্তি করতেন। মানে বুঝত না রোশেনারা। বাবার আবৃত্তি শুনতে ভাল লাগত, তাই শুনত। এমনি একদিন আবৃত্তি করতে করতে মনসুর আলি মেয়েকে ডেকে বললেন, 'শেক্‌স্‌পীয়ারের নাম শুনেছো তো মা?'

—হ্যাঁ, মস্ত ইংরেজ কবি।

—কেবল কবিই নন, কবি এবং নাট্যকার। তাঁর লেখা হ্যামলেট খুব নাম করা নাটক। বড় হয়ে পড়বে। এই যে আমি আবৃত্তি করছি, এ সেই হ্যামলেটের অংশ।

একটু থেমে আবার বললেন, হ্যামলেট হচ্ছে ডেনমার্কের রাজকুমার। হ্যামলেটের আব্বাজানের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই হ্যামলেটের মা হ্যামলেটের চাচাকে বিয়ে করে। ফলে হ্যামলেট অত্যন্ত মর্মাহত হয়। মায়ের ওপর তার অভিমান আসে। চাচার ওপর হয় প্রচণ্ড রাগ। কিন্তু কি করবে সে? দিনের পর দিন

শুধু নিজের মনেই পুড়তে থাকে।'

মেয়েকে কাছে বসিয়ে ধীরে ধীরে হ্যামলেটের কাহিনীটি বলে গিয়েছিলেন মনসুর আলি। গল্প বলতে বলতে জলে ভিজে গিয়েছিল তাঁর চোখ। রোশেনারার ঐ কচি বয়েসে হ্যামলেটের রস গ্রহণ করতে পারার কথা নয়, কিন্তু বাবাব চোখে জল দেখে সেও যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তারও চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিল।

এর মাস খানেক বাদেই মারা যান মনসুর আলি। আজও সেদিনটার কথা ভাবলে রোশেনারা মনে মনে কেমন শিউরে ওঠে।

মনসুর আলি প্রত্যেক শীতেই শিকারে বেরোতেন। অন্যবারের মত সেবারও বেরিয়েছিলেন। বিহারে রাঁচী থেকে অনেকটা দূরে কোন এক জঙ্গলে গিয়েছিলেন। শিকার থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মনটা খুশিতে ভরপুর। এবারের শিকার পুরোপুরি সফল হয়েছে। শিকারী জীবনে এবার তাঁর মস্ত সাফল্য। একটা প্রকাণ্ড মানুষ-খেকো বাঘকে এক গুলিতেই খতম করেছেন। এত বড় বাঘ এর আগে কখনও মারেননি। মানুষ-খেকো তো নয়ই।

বাবার পাশে বসে শিকারের গল্প শুনছিল রোশেনারা। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে এক সময় প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার এক গুলিতেই এতবড় বাঘটা খতম হয়ে গেল? বলো কী!'

—হ্যাঁরে বেটী হ্যাঁ, এক গুলিতেই খতম।

মেয়ের থুতনি ধরে আদর করলেন মনসুর আলি।

—তারপর?

—তারপর? তারপর গুলি খেয়ে বাঘটা যেই লুটিয়ে পড়ল, আমিও আনন্দে বাঘের দিকে ছুটতে গেলাম। অন্যান্য সবাই তখন বাধা দিয়ে বলল, 'আলি সাহেব, আগেই যেও না, ঐ বাঘটাকে আর একটা গুলি করে আগে সিওর হয়ে নাও ওটা মরেছে কিনা।'

—তুমি কি করলে?

—আমি হেসে বললাম, বাঘের দুটো চোখের মাঝখানে যেগুলি করেছি তা অব্যর্থ। দ্বিতীয় গুলির কোনো প্রয়োজন নেই।

—তুমি কাছে গেলে?

—হুঁ। সোজা বাঘটার কাছে গেলাম। বাঘটা তখন রক্তাক্ত। মাটিতে পড়ে রয়েছে। দেখে মনেই হয় না, এই বাঘটাই কম সে কম বিশটা মানুষ মেরেছে। কাছে গিয়ে বন্দুকের নল দিয়ে বাঘের গায়ে একটা গুঁতো দিলাম। একটুও নড়ল না। বুঝলাম একেবারে শেষ। তখন এল বাকী সবাই।

—বাঘটা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে ? না, আব্বা তুমি কখনও একনি করে যাবে না।

চোখ বড় বড় করে বলল রোশেনারা।

মনসুর আলি কোনো কিছু বলবার আগেই সালেমা বেগম এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। হাতে তার এক গ্লাস সরবৎ। বাইরে থেকে ফিরে আসবার পর এক গ্লাস সববৎ খান মনসুর আলি। বহুদিনেব এটা অভ্যেস।

মেয়ের দিকে চেয়ে বলল সালেমা, 'তুমি এখন এখান থেকে যাও বেবী। আব্বাকে বিরক্ত করো না, আব্বার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি গিয়ে পড়তে বসো।'

মায়েব কথায কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল বোশেনারা। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার মনের কথা বুঝলেন মনসুর আলি, তাই স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'বসে আছে থাক না।'

—না ও যাক। এত আদুরে হওয়া ঠিক নয়।

মার এ-কথার পর সোজা উঠে দাঁড়িয়েছিল রোশেনারা। ঘর থেকে একেবারে বেরিয়ে না গিয়ে ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। একেবারে বেরিয়ে যাবার আগে পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছিল। মনসুর আলি তখন গ্লাসের সরবৎ সবে শেষ করেছেন। সরবৎ খেয়েই তিনি যেন কেমন গুম হয়ে গেলেন।

গ্লাসটা হাতে করেই অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সালেমা বেগমের মুখের দিকে। সে-দৃষ্টির সামনে সালেমা বেগম যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একবার একটু হাসবারও চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠিক যেন পারল না।

রোশেনারা কিন্তু আর দাঁড়ায়নি, সোজা বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও বাবার মুখটা ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। অকারণ একটা ভয় তার মনটাকে ঘিরে ধরতে চাইছিল বারবার।

কথা বলতে বলতে হঠাতই যেন চুপ করে গেল রোশেনারা। কাঠ-ঠোকরা পাখীটার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। তারপর শুভাশিসের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'বাবা মাঝে মাঝে গান গাইতেন। খুব বেশী যে গান জানতেন তা' অবশ্য নয়।' খান কয়েক গানই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতেন। এর মধ্যে একটা গান ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। খুব আনন্দে বা খুব দুঃখে বাবা ঐ গানটা গাইতেন। তবে দুঃখের সময় গানটা যে-ভাবে গাইতেন, আনন্দের সময় ঠিক সে-ভাবে গাইতেন না। কোথায় যেন একটু তফাৎ হয়ে যেত। বাবার গলায় ঐ গানটা শুনলেই আমি তাঁর মনের অবস্থাটা বুঝতাম।'

একটু থেমে বলল, 'আমি বাবার কাছ থেকে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম বাবা তাঁর সেই প্রিয় গানটা গাইছেন। পাশের ঘর থেকে গানের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—

মুৎরিবে খুষনভা বেগু তাজাব তাজা নওবনও।
বাদয়ে দিলকুষা বেজু তাজাব তাজা নওবনও॥

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবা গানটা গাইছিলেন। বাবার গলায়

গানটা শুনতে শুনতে আমার যেন মনে হল, বাবার গলা কাঁপছে। গানের মধ্যে দিয়ে বাবার যেন কান্না ঝরে ঝরে পড়ছে। গান শুনতে শুনতে আমারও বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। বালিশে মুখ গুঁজে খানিকটা কাঁদলামও। অকারণেই কাঁদলাম। তখনও কিন্তু জানিনা কী ভীষণ কান্না আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

চোখ বুজে একটুকাল চুপ করে রইল রোশেনারা। তারপর চোখ মেলে শুভাশিসের চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'গানটা মহাকবি হাফেজের লেখা। তখন অবশ্য জানতাম না। জানবার কথাও নয়। অর্থও জানা ছিল না। তবু এই গানটা শুনলেই বুকটা যেন ফাঁকা হয়ে যেত। পরে, অনেক পরে, একটা বই থেকে গানের অর্থটা পেয়েছিলাম।'

শুভাশিস কৌতূহলী হয়ে রোশেনারার মুখের দিকে চাইল। রোশেনারা হয়তো শুভাশিসের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই বললে, 'দিলীপ রায়ের লেখা একখানা বই থেকে অর্থটা পেলাম। বইটার নামটা অবশ্য মনে নেই। হাফেজের এই গজলের ঠিক অনুবাদও করেন নি। ভাবানুবাদ।'

—তোমার মনে আছে?

প্রশ্ন করল শুভাশিস।

—হ্যাঁ আছে।

—একটু শোনাবে?

রোশেনারা কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসল। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগল,—

তোমার কলকণ্ঠে শুনী যেন শুনি নিতুই নব গান।
ঢালো তব নিতুই নব রঙিন সুধা উছল করো প্রাণ॥

চুপ করল রোশেনারা। শুভাশিসও চুপ করে রইল একটুকাল। তারপর রোশেনারার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'তোমার বাবাকে

বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না। আমার কেমন মনে হচ্ছে, তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। হাফেজ, রুমি, সুফী কবিদের মতই ছিলেন আত্মভোলা। ভাবের রসে ভরপুর। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তাঁর উদাসী মন সুফী-বাউলদের মতই অধরাকে ধরবার জন্য কেবলই ছুটে বেড়াত। সত্যি বলছি, তাঁকে বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না।'

শুভাশিসের কথায় কী ছিল কে জানে। ওর কথায় রোশেনারার কিন্তু চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হল। ভেতরের কান্নাকে সংযত করবার জন্য রোশেনারা তাড়াতাড়ি নীচের ঠোঁট-টাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। চোখের জল তবু বাধা মানল না। দু'চোখ ছাপিয়ে নেমে এল। রোশেনারা এবার শুভাশিসের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল, 'বাবাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, শুভ, কিছুতেই না। আজকাল তাঁকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখছি। স্বপ্নে বাবাকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন কী একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। তাঁর মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পাই। কী যে তিনি বলতে চান, কিসের যে তাঁর যন্ত্রণা কিছুই বুঝতে পারি না। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে যায়, মনে হয়, কে যেন দু'হাত দিয়ে আমার মাথাটাকে শক্ত করে ধরে আছে। ছটফট করতে করতে উঠে বসি। কিন্তু এরপর ঘুম আর আসে না। এ এক অসহনীয় অবস্থা।'

কথা শেষ করে রোশেনারা ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে নিলে। একটুকাল চুপ করে বসে থেকে ফিরে গেল আগের কথায়। সেই রাত্রের ঘটনা দিয়েই শুরু করল আবার।

রাত্রে রোশেনারার খাওয়া হয়ে গেলে মনসুর আলি মেয়েকে ডেকে পাশে বসালেন। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বসো মা বসো। দুটো কথা বলি।' বাবার একেবারে গা ঘেঁষে বসল রোশেনারা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মনসুর আলি

বললেন, 'লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ মা। লোভ যার মনে একবার বাসা বেঁধেছে তার আর নিস্তার নেই। লোভী মানুষ সব পারে, সব রকম খারাপ কাজ করাই তার পক্ষে সম্ভব। লোভকে তাই কক্ষনো মনে স্থান দেবে না।'

রোশেনারা চুপ করে রইল। মনসুর আলিও মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর এক সময় বললেন, 'ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। যত কষ্টই আসুক না কেন, পড়া-শুনো ছাড়বে না। সব সময় মনে রাখবে নিজের পায়ে যে দাঁড়াতে না জানে, পৃথিবীতে বাঁচার তার কোন অধিকার নেই। আমি যদি নাও থাকি, আমার কথা মনে রেখেই পথ চলবে।'

রোশেনারার চোখে চোখ রেখে আবার বললেন, 'বড় হয়ে এক দিন হয়তো নিজেই সব বুঝবে। সব বুঝবার পর তোমার যা ভাল মনে হবে তাই করো। তোমাকে কোন নির্দেশ দিতে চাই না। তবে এইটুকু জেনে রেখো, খোতাতালার দরবারে কারো বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই।'

মনসুর আলি কেন যে হঠাৎ এইসব বলতে শুরু করেছেন রোশেনারা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। সে রাত্রে বিছানায় শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। নানা রকমের ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। ভাবতে ভাবতেই কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল রোশেনারা। মাঝ রাতে কিসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কান খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করল কিসের এই শব্দ। ওর মনে হল, বাবার ঘর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ঘরের দিকে ছুটল সে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল রোশেনারা।

মনসুর আলি তখন বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছট-ফট করছেন। গলা দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। তাঁর দু'পাশে

হু'জন ডাক্তার। বড় নানী মাথার কাছে দাঁড়িয়ে খোদাতালার কাছে দোয়া ভিক্ষা করছেন। পাড়ার জানা হুই লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। মুখ কালো করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জহিরুল ইসলাম। তাকেও খবর দিয়ে আনা হয়েছে, যদি কোন প্রয়োজন হয়। ঘরের এক কোণে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে সালেমা বেগম।

রোশেনারা এক এক করে সকলের মুখের দিকে তাকাল। কী একটা অজানা ভয়ে বুকটা তখন থর-থর করে কাঁপছে। কারও তখন ওর দিকে চাইবার অবসর নেই। বাবার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এল রোশেনারার। ভয়ে ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ডাক্তার হু'জন অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। মনসুর আলি যেন ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররা রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। সবাই যখন রুগীকে তুলে নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল রোশেনারা, কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'তোমরা আব্বাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? কেন নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?'

এতক্ষণে সকলের দৃষ্টি পড়ল রোশেনারার ওপর। মনসুর আলি চোখ মেলে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে। কিছু হয়তো বলতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। আবার চোখ বুজলেন তিনি। রুগীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সবাই। ওর বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল রোশেনারা।

হাসপাতালে অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি মনসুর আলিকে। সকালের দিকেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কথা শেষ করে চুপ করে বসে রইল রোশেনারা। শুভাশিসও

চুপ। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শুভাশিসের কেবলই সালেমা বেগমের মুখটা মনে পড়ছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনারাই প্রথমে কথা বলল। শুভাশিসের চোখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বাবার মৃত্যুর বছর খানেক বাদেই জহিরুল মামার সাথে মার বিয়ে হয়ে গেল। সেই সময় আমার মনের ভয়ানক অবস্থা। কিছুই ভাল লাগে না। পড়াশুনো, খেলাধুলো কোনো কিছুতেই মন বসে না। বেশীর ভাগ সময়ই বড় নানীর ঘরে গিয়ে বসি। তিনি আমার মাথায় চুমু খেয়ে আদর করেন, নানা গল্পে ভুলিয়ে রাখেন আমাকে। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। স্কুল-কলেজের গণ্ডী পেরোবার পর চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। মা আপত্তি করলেন। মার আপত্তিতে আমি কান দিলাম না। আমি তখন আমার জীবনের গতি ঠিক করে ফেলেছি। একটা চাকরিও জুটে গেল। মার তীব্র অমতেই চাকরিতে যোগ দিলাম। তারপরের দিণগুলো একভাবে কাটছিল। কতকটা বৈচিত্র্যহীন ভাবেই। এর মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার মনটাকে বেশ নাড়া দিল। ঠিক ঘটনা নয়, একটা আবিষ্কার বলতে পার। একদিন বাবার বইগুলো উল্টে-পাল্টে গুছিয়ে রাখছি, খুলে খুলে দেখছি, হঠাৎ হাতে লেখা একটা কাগজ আমার নজরে পড়ল। বাবারই হাতের লেখা। কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। কাগজটায় হ্যামলেটের একটা কোটেশন, আর সেই সঙ্গে বাবার নিজের মনের কয়েকটা কথা। এতদিন যে দিকটা আমার কাছে ঝাপসা, অস্পষ্ট ছিল, লেখাটা পড়ে সেদিকটা আমার কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল। আমার কাছে সেদিন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। বাবাকে খুন করা হয়েছে।'

—খুন!

শুভাশিস যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ। ষড়যন্ত্র করে সুস্থ মাথায় বাবাকে খুন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অনেক দিন থেকেই বাবাকে স্লো পয়জন করা হচ্ছিল। খাবারের সঙ্গে কিংবা জলের সঙ্গে সে বিষ দেওয়া হত। বাবা যে কিছুই বুঝতেন না তা নয়, অনেক কিছুই বুঝতেন। তবে খুব সম্ভব প্রথম দিকে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। যখন সব বুঝতে পেরেছিলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই হয়তো এ-বিষয়ে কাউকে কিছুই বলেন নি। অথবা মানুষের ওপর তীব্র অভিমানেই সব কিছু জেনেও চুপ করে ছিলেন। মাঝে-মাঝে অবশ্য মাকে তাঁর অপরাধের কথা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন। তখন বুঝিনি এখন উপলব্ধি করতে পারি। যে কারণেই হোক, বাবা মৃত্যুকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে কোনো জটিলতাও সৃষ্টি হয়নি। সবাই জেনেছিল, একটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক মৃত্যু।

রোশেনারা থামল। শুভাশিসের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চাইল। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল অন্যদিকে। তারপর আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুভাশিসের দিকে চাইল। ওর দু'চোখে তখন জল টলমল করছে। ধীরে ধীরে বললে, 'ভাবতে পার শুভ এই সালেমা বেগম, যে কিনা সুস্থ মাথায় তার স্বামীকে হত্যা করেছে, সেই আমার মা? আমার নিজের মা? আমার গর্ভধারিনী? ভাবতে পার? এত বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা পৃথিবীতে বোধ হয় আর কখনও ঘটেনি!'

রোশেনারার দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তবু বলে চলল রোশেনারা, 'বাবার সেই লেখাটা পড়বার পর নিজেকে নিয়ে যেন বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লাম। একদিকে মায়ের কলঙ্ক, আবার অন্যদিকে বাবার শোক। নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারতাম না। কেবলই মনে হত, পৃথিবী থেকে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলি। কত সময় আমাদের বংশের সেই মহান পুরুষের উদ্দেশ্যে বলেছি,

হে মহাপুরুষ আমায় পথ বলে দাও। কিন্তু পথ পাইনি। কেবল অশান্তির আগুনে পুড়েছি। মনের যখন এমনি অবস্থা তখনই তোমার দেখা পেলাম। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, তোমায় দেখে মনে হল, তুমি যেন প্রচণ্ড বর্ষার পরে একমুঠো রোদ্দুর। হঠাৎ যেন পথ পেয়ে গেলাম। মরার জগৎ থেকে বাঁচার জগতের ইঙ্গিত পেলাম। মনে মনে স্থির করলাম, এবাব থেকে তোমার সঙ্গে তোমার মত হয়েই বাঁচব।'

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে বলল, 'অনেক ঠেকে বুঝলাম, তুমি অনেক দূরের মানুষ। তোমার নাগাল পাব না। তোমার কাছে যাবার সাধ্য আমার নেই। এটা যখন বুঝলাম তখন পৃথিবীটাও আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। মনটা ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই পুরণো ভাবনায় এসে স্থির হয়ে গেল।'

শুভাশিস কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রোশেনারা হাত তুলে শুভাশিসকে থামতে বলে নিজেই বলে চলল, 'এরপর কতবার যে হ্যামলেট নাটকটা পড়েছি তার ঠিক নেই। ' কতবার হ্যামলেটের মনের সুরের সঙ্গে আমার মনের সুর মিলে গেছে। মনে হয়েছে, হ্যামলেটের পথই আমার পথ।'

—তুমি কি—?

কী একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না শুভাশিস।

একটু ম্লান হাসি হাসল রোশেনারা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'হ্যাঁ, বাবার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকারই নেই। তাদের মৃত্যুর জন্যও দায়ী হবে মনসুর আলি খাঁর উত্তরাধিকারিণী। এটাই আমার পথ।'

শেষের দিকে রোশেনারার গলার স্বরটা দৃঢ় শোনাল।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল শুভাশিস।

রোশেনারা বলতে লাগল, 'করব কি করব না—টু ডু অর নট

টু ডু—এই প্রশ্নের দোলায় অনেকবার দুলেছি। শেষ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পেরেছি। হ্যাঁ, করতেই হবে। ওদের শাস্তি আমাকে দিতেই হবে। কিন্তু কাজে নামবার আগে তোমাকে সব কিছু খুলে না বলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাই ছুটে আসতে হল তোমার কাছে।'

শুভাশিস ভুরু কুঁচকে চাইল রোশেনারার মুখের দিকে। রোশেনারা শুভাশিসের চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, 'একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? উত্তরটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

—উত্তরটা জানা থাকলে নিশ্চয় দেবো।

রোশেনারা একটুকাল কী ভাবল, তারপর বলল, 'যতবার আমি তোমার কাছে আসতে চেয়েছি ততবারই তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিয়েছ। কিছুতেই কাছে আসতে দাওনি। কিন্তু কেন? আমি মুসলমান বলে, না আর কিছু? জানি প্রশ্নটা একটু বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। এ-ও জানি, ভালোবাসা কোনো নিয়ম মেনে চলে না। তবু জানতে ইচ্ছে করছে, কেন তোমার ভালবাসা পেলাম না?'

কিছুক্ষণ রোশেনারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুভাশিস। তারপর শান্তভাবে বলল, 'তোমার ধারণা ভুল।'

—কোন ধারণা?

—আমার ভালবাসা সম্বন্ধে। আমি তোমায় ভালবাসি না তোমার এ-ধারণা ঠিক নয়। ভালবাসি, আর ভালবাসি বলেই তোমার কল্যাণের কথা ভেবে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছি।

—মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে।

ওর এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগ-অভিমান-ক্ষোভ-দুঃখ সব যেন ফেটে পড়ল ওর ঐ কটি কথার মধ্যে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুটো। হঠাৎ নিজের দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করল। চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর সমস্ত শরীর। অস্ফুট স্বরে বলল, 'কল্যাণ! আমার কল্যাণ?'

এ-অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে পেল না শুভাশিস। খানিকটা সময় চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'বিশ্বাস করো বেবী। আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি। সত্যিই আমি তোমায়—'

—না আমি চাইনা। চাইনা তোমার ভালবাসা।

উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠল রোশেনারা। মাথা তুলে সোজা চাইল শুভাশিসের দিকে। চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, দু'গালে জলের ধারা।

শুভাশিস অসহায় বোধ করতে লাগল। খুব আস্তে বলল, 'তোমাকে কষ্ট দিয়ে নিজেও কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু পথ পাইনি। সমাজ আমায টেনে রেখেছে, কিছুতেই এগোতে দেয়নি।'

—সমাজ!

অদ্ভুতভাবে এবাব হেসে উঠল রোশেনারা। সে হাসির সঙ্গে কান্নাও যেন জড়িয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল, 'সমাজের দোহাই দিয়ে বেশ সস্তায় বাজীমাৎ করতে চাইছো তো!'

রোশেনারার কথায় হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল শুভাশিস। প্রায় আর্তনাদ করে বলল, 'বেবী আমি, তোমায় কি করে বোঝাব যে, এই পচা-গলা সমাজটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য মনটা আমার বারবার বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। ভেঙে এমন এক সমাজ গড়তে চেযেছে যেখানে রোশেনারা শুভাশিস সহজভাবে দুজন দুজনকে ভালবাসতে পারে। ভালোবেসে সুখী হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করতে পারেনি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে।'

একটু থেমে আবার বললে, 'আজ মনে হচ্ছে, আমি পারি। সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আমি পারি।'

—শুভ!

গলাটা কেঁপে উঠল রোশেনারার।

কতকটা আপন মনেই বলতে লাগল শুভাশিস, 'মানুষে মানুষে যোগ ঘটানোই যে সব চেয়ে বড় সাধনা, সব ধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম,

এতদিন আমার মনটা যেন এই কথাটাই খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু পায়নি। কেমন করে জানি না। তোমার বাবার কথা শুনতে শুনতে আজ সেই কথাটাই আবিষ্কার করে ফেললাম। ধর্মের ব্যাখ্যা আমার কাছে নতুন করে ধরা পড়ল। তাই বলছিলাম, আমি পারি। সমাজের বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ করতে পারি।'

—কিন্তু আমি পারি না শুভ। আমার পথ থেকে আমি আর সরে আসতে পারি না। বাবার ঋণ আমায় শোধ করতেই হবে।

বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলতে চেষ্টা করল রোশেনারা। কিন্তু ঠিক ততটা জোর যেন ওর কথায় প্রকাশ পেল না।

—ও-পথে ঋণ শোধ হবে না বেবী। ঋণের বোঝা বরং আরও বাড়বে।

—কিন্তু ওদের শাস্তি না দিলে বাবা যে শান্তি পাবেন না শুভ। স্বপ্নে যে বাবার যন্ত্রণা-কাতর মুখটা দেখতে পাই।

দুটো অসহায় চোখ তুলে শুভাশিসের দিকে চাইল রোশেনারা।

—যে-পথে গেলে তোমার বাবা শান্তি পান সে-পথ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। অপেক্ষা করো, আমরা নিশ্চয় সে-পথ খুঁজে পাব।

রোশেনারা কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য শুভাশিসের মুখের দিকে চেয়ে রইল। শুভাশিসের কথার অর্থটা ঠিক যেন ধরতে পারল না। অস্পষ্টভাবে তাই বলল, 'আমরা? আমরা মানে?'

—আমরা মানে আমরা। তুমি আর আমি। আমরা যদি এক সঙ্গে অনুসন্ধান করি তবে নিশ্চয়ই একটা পথ খুঁজে পাব। বলো, পাব না?

রোশেনারা করুণ-কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি যে তোমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ দারুণ-ভাবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমায় মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ না-তো?'

শুভাশিস রোশেনারার কথার কোন উত্তর দিল না। কেমন

এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে রোশেনারার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রোশেনারা শুভাশিসের সে-দৃষ্টির মধ্যে নিজের উত্তর যেন খুঁজে পেল। ওর চোখে তাই ফুটে উঠল এক অপূর্ব দীপ্তি। একটু একটু করে রোশেনারার চোখ দুটো আবার জলে ভরে এলো, সেই সঙ্গে ওর ঠোঁটের কোণে দেখা দিল এক টুকরো হাসি।

কেউ আর কোনো কথা বলল না। দুজনে দুজনার দিকে চেয়েই রইল, যেন অনন্তকাল ধরে ওরা এমনি করে চেয়ে থাকবে।

তারপর আরও অনেকক্ষণ বসে ছিল ওরা। নিজেদের মধ্যে এমন তন্ময় হয়েছিল যে, স্থান-কালের গণ্ডীটা ওদের মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল।

দিনের আলো তখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, নীড়ে-ফেরা পাখীদের মধ্যে পড়েছে সাড়া, আর গাছে গাছে তখন চলেছে চুপি চুপি আলাপন। এমন সময় ওদের কানে ভেসে এলো একটা গানের মিষ্টি সুর। সেই সুর শুনে ওদের তন্ময়তা ভাঙল। চার দিকটা ভাল করে চেয়ে দেখল। সুরের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল, আপন মনে গাইতে গাইতে দূর থেকে এগিয়ে আসছে একটা লোক। দিনের শেষের ক্ষীণ আলোয় একটা আবছা মূর্তি যেন, গানের কথাও স্পষ্ট নয়। কেবল একটা আমেজময় সুর ভেসে আসছে কানে। লোকটি যতই এগিয়ে আসতে লাগল কাছে ততই তার চেহারাটাও ওদের চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠতে লাগল। অদ্ভুত সাজ-পোষাক পরা মানুষটি। বাউল ফকিরের বিচিত্র সংমিশ্রণ। বিভিন্ন রঙের কাপড় দিয়ে তৈরী আলখাল্লা গায়ে, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। এক হাতে এক তারা, আর এক হাতের কনুই-এর কাছে দুলছে সাদা একটা চামর। ' আরও একটু কাছে এগিয়ে আসতেই দেখা গেল, গলায় রয়েছে এক গোছা কাঁচের মালা। কাঁধে ঝুলছে বড় একটা ঝোলা।

আপন মনে গাইতে গাইতে চলেছিল সেই মানুষটি। কিন্তু সামনে দুটি মানুষকে একান্তে বসে থাকতে দেখে ক্রমশঃ সেই

দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ভিক্ষেই হয়তো উদ্দেশ্য। গানের কথাগুলোও তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রোশেনারা কান পেতে শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কতকটা আপন মনেই বললে, 'কী আশ্চর্য! এ গান ও পেল কোথায়?'

রোশেনারার কথায় শুভাশিসও এবার মন দিয়ে শুনতে লাগল। লোকটি তখন গাইছে—

ভাইরে জাতের বিচার কুলের আচার
যত কড়াকড়ি
সব এই বাংলা দেশে ছিন্ন বেশে
যায় গড়াগড়ি।
হেথায় যে-ই বাবাজী সে-ই যে গাজী
নাইরে ভেদের ক্লেশ
দ্যাখো সত্যপীরে পূজো করে
এই গাজী বাবাজীর দেশ।

রোশেনারা শুভাশিসের দিকে চেয়ে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ ও কি গান গাইছে?'

—তা পাচ্ছি। কিন্তু এতে অবাক হবার কি আছে?

—অবাক হবার নেই? বলো কী তুমি? এই গানই যে দবীর খাঁ গাইতেন। তাঁরই লেখা গান। এই লোকটি একটু ওলট পালট করে গাইছে। কিন্তু এ-গান ও পেল কোথায়? কোথায় পেল? এটা আমায় জানতেই হবে।

লোকটা যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই উত্তেজিত হয়ে পড়ল রোশেনারা। উত্তেজিত হয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা ততক্ষণে ওদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। লম্বা রোগা চেহারা। গায়ের রঙ কালো। মুখে পাকা দাড়ি। পাগড়ির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে লম্বা সাদা চুলের অংশ। বয়েস ষাট-সত্তর হবে।

ঠোঁটের কোণে এক ফালি হাসি। শুভাশিসের মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলছে।

রোশেনারা কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই করল না লোকটি। শুভাশিসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল 'বাবু মশায়ের কতি হনে আসা হইল্‌চে হে? কলকাত্তা?'

—হ্যাঁ, কলকাতা থেকেই আসছি। কেন?

লোকটি একগাল হেসে বলল, 'হতেই হবে। তা মশায়ের সাথে দেখা হয়ে বড় খুশি হইচি।'

শুভাশিস কিছু বলবার আগেই লোকটি গাঢ় স্বরে এবার বলল, 'মা ভালো আছেন তো?'

—উঁ?

ভুরু কুঁচকে চাইল শুভাশিস। প্রশ্নটা আশাই করেনি সে। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

লোকটি একই প্রশ্ন করল আবার, 'মা কেমন আছেন?'

—মা? মা ভালই আছেন।

এবার উত্তরটা দিতেই হল শুভাশিসকে।

—আর মাসী? মাসীর বিয়া হইল্‌চে?

ফকিরের প্রশ্নের মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু অবাক না হয়ে পারে না শুভাশিস। অবাক হয়ে ভাবল, লোকটা জ্যোতিষ-টোতিষ জানে নাকি? এসব তো ওর জানবার কথা নয়। মাসী কেমন আছে? মাসীর বিয়ে হয়েছে কিনা। ভাবতে ভাবতে প্রশ্নটা করেই ফেলল শুভাশিস, 'আচ্ছা আপনি কি আমায় চেনেন? আর কখনও আমায় দেখেছেন?'

—হ্যাই দ্যাখো! আবার আপনি আজ্ঞা কইরচ কেনে হ্যা? ঐ সব ভালো ঠেকে না।

মাথা নাড়তে নাড়তে বলল লোকটি।

একটু থেমে তারপর নীচু গলায় বলতে লাগল, 'আর চেনা-জানার

কথা যদি শুধোও, তব্যে বলি কে কার অচেনা? কেউ কারো অচেনা লয়, সবাই সবার চেনা। ওপরের পর্দাটা থাকে বলেই না চেনা জনকেও চিনতে পারি না। পর্দাটো সরিয়ে দাও, ব্যস, সবাই সবার চেনা জানা। কি ঠিক কিনা?'

—কিন্তু ওসব তো গেল অন্য কথা। সত্যিই কি তুমি আমায় কখনও—?

হাসতে থাকে লোকটি।

—আছে আছে, চেনার একটু সূত্র আছে বৈকি!

শুভাশিসকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে লোকটি। তারপর একতারাটায় সুর তুলতে তুলতে বলে, 'তব্যে আজ সে কথা লয়। বুইলব, আর একদিন বুইলব। আগে আমার কুঁড়েতে তোমায় আইসতে হবে। দেখা যখন একবার পেইচি তখন আমার কুঁড়েতে না যেইলে মন মাইনছে না হ্যা। আমার কুঁড়েতে যাবে তো?'

এবার শুভাশিস হাসল, হেসে প্রশ্ন করল, 'বাড়ি কোথায় তোমার?'

—বেশী দূর লয়। মুর্শিদাবাদ শহর থেইকে মাইল খানেক উত্তরে। মুর্শিদাবাদ ইষ্টিসানে যাকে জিজ্ঞেস কইরবে, গাজী-বাবাজীর ভিটে কোতি, সে-ই বুইলে দেবে। বুঝলে কিনা, এই চামর একতারা আর পাগড়িটোরে সকলে চিনে।

—গাজীবাবাজী! তুমি হিন্দু না মুসলমান? কি নাম তোমার?

গাজীবাবাজী নামটা শুনে শুভাশিস অবাক হয়েই প্রশ্ন করে।

শুভাশিসের কথায় ঠা-ঠা করে হেসে উঠল লোকটি। সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না। টুংটুং করে একতারাটা বাজায় আর হাসে। হাসি থামিয়ে এক সময় বলল, 'এইটো কি একটা প্রশ্ন হল্য হ্যা? হিন্দু না মুসলমান? এর কিছু জবাব আছে?'

—এর জবাব নেই ? বলো কি !

—তব্যে বলি শোনো।

কথাটা বলেই একতারায় সুর তুলে গান ধরল গাজীবাবাজী—

মুসলমানে বলে গো আল্লা হিঁদু বলে হরি,
নিদান কালে যাবে রে ভাই একই পথে চরি' রে
দোয়ানি করিবা আল্লারে।

গান থামিয়ে হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগল, 'বুঝলে কিনা, এই বাংলা দেশের মাটি, একি যেমন তেমন মাটি ? এই মাটিতে সোনা ফলে। এই নরম মাটির দেশ হল্য হিদয়বানের দেশ। এখেনে কি ঐ জাত-ধর্মের কড়াকড়ি চইলবে হ্যা ? এখেনে যেই আল্লা সে-ই হরি। যে-গাজী সে-ই বাবাজী। এ দেশ হল্য গিয়ে গাজী-বাবাজীর দেশ। আর আমার নামের কথা যদি শুধোও তব্যে বলি, মা ডাইকতো হাফেজ বল্যে, আর বাবা ডাইকতো জয়দেব। এইবার বুঝে লেও আমার জাত কি, ধম্ম কি ?'

কথা শেষ করে দুষ্টু চোখে মিটি মিটি হাসতে লাগল বুড়ো।

শুভাশিসের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না। কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। কথায় আর গানে গাজী-বাবাজী ওদের মধ্যেকার অচেনা-অজানার বাধাটা সত্যিই যেন দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সরিয়ে দিয়ে কেমন এক আন্তরিকতার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল সেখানে। বহুদিনেব একান্ত পরিচিত জনের মতই যেন হাব-ভাব। অবাক হয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল শুভাশিস। ভাবছিল, কী এমন আছে এই অদ্ভুত ধরণের মানুষটির মধ্যে যা তাকে এমন করে কাছে টানছে !

রোশেনারা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল লোকটিকে। অবাক হযে শুনছিল ওর সব কথা। এতক্ষণ তাকে কোনো কিছু প্রশ্ন করার অবকাশই পায় নি। কিন্তু এবার যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। যে প্রশ্নটা

এতক্ষণ মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল গাজী-বাবাজীর দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই প্রশ্নটা এবার করেই ফেলল। খুব শান্ত কণ্ঠে বলল, 'একটা প্রশ্ন করবো ?'

রোশেনারার কথায় গাজী-বাবাজী যেন এই প্রথম উপলব্ধি করল, আরও একজন মানুষ সেখানে উপস্থিত। সে যেন এই প্রথম টের পেল রোশেনারার অস্তিত্ব। চোখ সূক্ষ্ম করে তাই হয়তো একবার ভালো করে দেখে নিল। তারপর হেসে উত্তর দিলে, 'একটা কেনে গো শতেক প্রশ্ন শুধোও না !'

—বলছিলাম, ঐ যে গানটা গাইছিলে, সত্যপীরে পূজো করে গাজী-বাবাজীর দেশ, ঐ গানটা তুমি কোথায় পেলে ?

—কেনে বলো তো ?

চোখ সূক্ষ্ম করল গাজীবাবাজী।

—এমনিই, একটু জানতে ইচ্ছে করছে আর কী !

একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিল রোশেনারা।

—গানটা তব্যে ভাল লেইগেছে বলো ? তা' গানটা আমায় শিখিয়েছিল আমার বাপ। বাপ শিখেছিল তার বাপের কাছে।

—তার আগে ? মানে, প্রথম তোমরা কোথেকে এ-গান পেয়েছিলে ?

—সে অনেক কালের কথা গ নবাব বাদশার আমলে আমাদের এক পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের এক ফকিরের মুরীদ হইছিল। আমাদের বংশের সেই মানুষই পয়লা গাজী বাবাজী। সে-ই তার গুরুর কাছে শিখ্যেছিল এই গান। সে সব অনেক কালের কথা গ।

কেমন অবাক হয়ে লোকটির দিকে চেয়ে রইল রোশেনারা। কিছুক্ষণের জন্য ওর মুখে কোনো কথা সরল না। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুভাশিসের দিকে চেয়ে বলল, 'ও যা বলছে তার অর্থটা বুঝতে পারছো শুভ ?'

—অর্থ ? নাঃ ! বিশেষ কোনো অর্থ তো বুঝতে পারছি না।

চোখ সূক্ষ্ম করল শুভাশিস।

—ও যা বলছে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, ও হল দবীর খাঁর শিষ্যের বংশধর। ওর পূর্বপুরুষ দবীর খাঁর শিষ্য।

—হাঁ তাই বটে। আমাদের গুরুর নাম দবীর খাঁ-ই বটে।

রোশেনারার কথার পিঠে পিঠে বলে উঠল গাজীবাবাজী। একটু থেমে গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করল, 'কিন্তক তুমি জানলে কি করে মা ?'

—আমি জানব না ? দবীর খাঁ যে আমাদের পূর্বপুরুষ।

—বটে !

গাজী বাবাজীর চোখে বিস্ময়।

শুভাশিসের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভাবের ঘোরে বলতে লাগল রোশেনারা, 'তোমার ভাবতে অবাক লাগছে না, শুভ যে, এই সেই ভাগীরথী আর এই সেই স্থান যেখানে একদিন সেই মহান মানুষটি নিজেকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন ? কিন্তু মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন জীবনের নতুন আলো। আশ্চর্য্য, আজ এখানে দাঁড়িয়েই তাঁর শিষ্যের এক বংশধরের মুখে শুনতে পেলাম তাঁরই লেখা গান। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তাঁর আশীর্বাদ পেলাম। সত্যি এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।'

গাজী-বাবাজীও একতারাটায় সুর তুলতে তুলতে রোশেনারার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল ওকে। রোশেনারা থামতেই ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার কি নাম মা ?'

—রোশেনারা।

—আমাদের গুরু বংশের মেয়ে তুমি। আজ থেকে তুমি আমার মা।

গাজীবাবাজীর চোখ দুটো একটু চিক চিক করে উঠল।

একটু থেমে কতকটা আপন মনেই বলল, 'গুরু তোমার মহিমে বোঝা ভার!'

এক অদ্ভুত চোখে একবার রোশেনারা আর একবার শুভাশিসের দিকে চাইল। কী বুঝল সে-ই জানে। আপন মনেই সুর করে বলতে লাগল, 'গুরু আমার বল্যে কিছুই নাই, তুমি যা করাও করি তাই। ভাল মন্দ বুঝিনা তুমিই আমার সার।'

শুভাশিসের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে এবার বলল গাজীবাবাজী, 'বইসে রইলে কেনে হ্যা? উইঠে দাঁড়াও, ভাল করে দেখি।'

কিছু না বুঝেই উঠে দাঁড়াল শুভাশিস। গাজীবাবাজী একতারাটা সমেত খপ করে শুভাশিসের একটা হাত ধরে ফেলল। তারপর আর একটা হাত দিয়ে ধরল রোশেনারার একটা হাত। আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'পূব আর পশ্চিম, কাশী আর কাবা, দুই আজ এক সাথে ধইরে ফেল্যেছি, বুকটা আমার ফুলে ফুলে উঠছে হ্যা। গুরু সবই তোমার দয়া।'

গাজীবাবাজীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। শুভাশিস আর রোশেনারা বিহ্বল চোখে চেয়ে রইল সেই অদ্ভুত মানুষটার মুখের দিকে।

কিছুকাল পরেই গাজীবাবাজী ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। যাবার আগে ওদের হাত দুটো ধরে বলল, 'আমার কুঁড়েতে কিন্তু একদিন যেতে হবে। না যেইলে দুঃখু পাব।'

—যাব নিশ্চয় যাব।

দুজনেই এক সাথে বলল ওরা।

বিদায় নিয়ে যাবার পর বার বার পেছন ফিরে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল গাজীবাবাজী। তারপর একটু একটু করে সে যখন দূরে পথের বাঁকে হারিয়ে গেল, তখন সেই দিকে চেয়ে কেমন অস্পষ্ট ভাবে বলল শুভাশিস, 'লোকটা যেন জাদু জানে!'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোশেনারা বলল, 'আমার সব ভাবনা-চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে গেল।'

আরও খানিকটা সময় চুপ করে বসল ওরা। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় শুভাশিসের একটা হাত ধরে রোশেনারা বলল, 'আমার আবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করছে শুভ। আমায় তুমি বাঁচাও। ও বাড়ির বদ্ধ আবহাওয়া থেকে আমায় বাঁচাও শুভ।'

রোশেনারার সেই আবেগ-বিহ্বল মুহূর্তে শুভাশিস কোন উত্তব দিতে পারেনি। সে কেবল নিজের দুটো হাত দিয়ে রোশেনারাব হাতটা চেপে ধরে রইল। আর চোখের জলের ভিতর দিয়ে রোশেনারা চেয়ে রইল শুভাশিসের চোখের দিকে। কারও মুখে কোনো কথা সরল না। দিনের আলো তখন নিভে গেছে, অন্ধকার এগিয়ে এসেছে, ওদের কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল রইল না। অপলক চোখে চেয়ে রইল দুজনে দুজনার দিকে।

কথা বলতে বলতে চুপ কবে গেল শুভাশিস।

—তারপর ?

প্রশ্ন করলাম আমি।

--মেয়েদেব একটা মেসে সেই রাতটা কাটিয়ে পব দিন সকালের ট্রেনেই বেবী ফিরে এলো কলকাতায়।

—এরপর তোর ওখানে আর যায়নি ?

—কেন যাবে না ? অনেকবারই গেছে।

—আর সেই গাঞ্জা বাবাজী ? তার ওখানে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ গিয়েছি। একবার নয়, অনেক বার। যতবারই তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, প্রথম দিন আমায় কি করে চিনেছিল, ততবারই

এড়িয়ে গিয়ে হেসে বলেছে, বলব হে বলব, সময় হলেই বলব। আজও কিছুই বলেনি।

—বলার কিছু নেই বলেই হয়তো বলেনি। ওটা হয়তো একটা এ্যাকসিডেন্ট। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছিল, লেগে গেছে।

—আমার মনেও এ সন্দেহটা উঁকি মেরেছে। তাই এবার বাবাজীকে চেপে ধরেছিলাম। উত্তরে একটু গম্ভীর হয়ে বলেছে, তুই পেড়াপেড়ি না করলেও এবার সব বলতাম। এবার বলার সময় হয়েছে। কলকাতা থেকে ঘুরে আয় সব বলবো।

একটু থেমে কতকটা নিজের মনেই বলল, 'দেখি গাজী কী বলে।'

আমার মনে তখন একটা প্রশ্নই বার বার মাথা খুঁড়ে মরছিল। ভাবছিলাম কোথায় এর শেষ? কোথায় ছুটে চলেছে এরা? কি এর পরিণতি? শুভাশিসের মায়ের কথাটা মনে পড়ল। ওর মা একদিন বলেছিলেন, 'শুভ এমন কাজ করতেই পারে না, যা অন্যায় যা ওর মাকে আঘাত করতে পারে।' কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, শুভাশিস সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু করতে চলেছে। এমন একটা কিছু যা ওর মাকে নিদারুণ আঘাত করবে।

জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল শুভাশিস। তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'মা আজকাল প্রায়ই বাবার কথা বলেন, বাবা কী-ভাবে হাসতেন, কী ভাবে কথা বলতেন, ছেলেমেয়েদের কী ভাবে আদর করতেন, কী খেতে ভালোবাসতেন—এই সব। মাঝে মাঝে আবার বলেন, আমরা নাকি কেউই বাবাকে বুঝতে পারিনি, মা নিজেও না। মার এখন ধারণা, বাবাকে কেউ ঠিক মত বোঝেনি বলেই তাঁকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই সব বলতে বলতে মা এক এক সময় কেঁদেও ফেলেন। তখন ভারি খারাপ লাগতে থাকে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়।

মনে হয়, আমার জন্যই বাবা আজ সংসার ত্যাগী। আমার সেদিনের আঘাতটাই বাবাব মনটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। এরপর সেই ভাঙ্গা মন নিয়ে কিছুতেই আর সংসারে থাকতে পারেন নি। কথাটা ভাবলেই মনটা হু হু করে ওঠে '

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা আজ কোথায় কি ভাবে আছেন ক জানে।'

আমি চুপ করেই রইলাম। শুভাশিস চুপচাপ বসে রইল একটুকাল। তারপব সোজা হয়ে বসে বলল, 'আব এক কাপ চা খাওয়াতো দেখি। শরীবটাকে একটু চাঙ্গা কবে নি। শরীরটা বড্ড ঝিমিয়ে প'ড়েছে।'

আমি উঠবাব আগেই শুভাশিস আবাব বলল, 'বুঝলি, হোসেনদাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। যতটা কাজ করব ভাবি ততটা করতে পাবি না। কাজ করাব কোনো এনার্জি পাই না। তাই মনের সমস্ত অবস্থাব কথা জানিয়ে হোসেনদাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি একটা উত্তবও দিয়েছেন '

একটা চিঠি পকেট থেকে বাব করে বলল, 'পড়ে দেখতে পাবিস। বড চিঠি। সবটা পড়তে ইচ্ছে না হয়, আণ্ডাব লাইন করা জায়গা গুলোই পড। তোর জন্যই আণ্ডাব লাইন করা।'

হাতে নিয়ে দেখলাম সত্যিই বড চিঠি। কাজেই আণ্ডার লাইন করা জায়গা গুলোই বেছে বেছে পডতে লাগলাম। হোসেনদা লিখেছেন, "..... একক লডাই-এব মাধ্যমে বড কোনো কিছু করাই সম্ভব নয়। লড়াই করতে হলে যৌথ-ভাবেই করতে হবে। ......সামাজিক জীবনে যে ধর্মীয় প্রাচীরের কথা বলেছো সে প্রাচীর কারো একার শক্তিতে ভাঙা সম্ভব কি? একা হয়তো একটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবে, কিন্তু তার মূল্য কতটুকু? এমন উদাহরণ তো আমাদের সামনে অনেক আছে, কিন্তু তাতে কি ধর্মীয় প্রাচীর ভেঙে পড়েছে? পড়েনি। পড়া

সম্ভবও নয়। আমি বলি, ও পথে যেওনা, ওতে কারও কোনো উপকার হবে না। লড়াই-এর ময়দানে আর এক জন সঙ্গী পেলে সেটাই বড় কথা। বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও, দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাও। বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য তোমাদের মধ্যে যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে তা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। বৃহত্তর কাজে তোমাদের প্রেমকে সফল করো।......"

ঐ ক'টা লাইন পড়া শেষ করে শুভাশিসের দিকে চেয়ে বললাম, 'হোসেনদাকে তাহলে রোশেনারা সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়েছিস?'

—কিছু কিছু জানিয়েছি। কিন্তু ব্রাদার আগে আর এক কাপ চা।

চা নিয়ে ফিরে এসে বসলাম আবার। চা-য়ে একটা চুমুক দিয়ে শুভাশিস বলল, 'দিন কয়েক আগে হঠাৎ বেবী আমার ওখানে গিয়ে হাজির। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতন চেহারা। কিছু একটা আশঙ্কা করলাম আমি। কিন্তু কোনো কিছু প্রশ্ন করার আগেই বেবী আমার একটা হাত ধরে বলল, 'তুমি আমার জন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। ওখানে থাকলে যে কোনো সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।' বেবীর কথায় একটু নার্ভাস হয়েই বললাম, কিন্তু আমি কি ব্যবস্থা করব? আমার কথায় ও ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে গেল। আমার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, আজ পালাতে চাইলে চলবে না। পালাতে দেব না। ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে। তোমাকে পালাতে দেব না, কিছুতেই না।'

—পালাতে দেব না মানে?

প্রশ্ন করলাম আমি।

—আমিও তখন মানে বুঝতে পারিনি। বোঝার মত সময়ই পাচ্ছি না। বেবী উত্তেজিত হয়ে বলেই চলল, 'সেদিন তুমি কেন

আমায় নতুন করে বাঁচার লোভ দেখিয়েছিলে? আমি তো আমার পথ বেছেই নিয়েছিলাম। তুমি কেন সেই পথ থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে এলে? কে তোমায় সরিয়ে আনতে বলেছিল? বলো কে তোমায় বলেছিল?' বলতে বলতে উত্তেজনায় ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে অসহায়ভাবে বলল, 'আমি যে ও পথে আর ফিরতে পারব না শুভ। ফেরার শক্তি যে আমার হারিয়ে গেছে।"

বলে অন্য দিকে চেয়ে থাকল শুভাশিস।

—তারপর?

শুভাশিস থামতেই প্রশ্ন করলাম আমি।

—তারপর একটু একটু করে নিজেই শান্ত হয়ে গেল ও। তবে সেদিন আর কলকাতায় ফিরতে চাইল না। রাতটা কাটাল মেয়েদের সেই মেসটায়। ভাবলাম, সকালে ফিরবে। কিন্তু না, তাতেও রাজী হল না। তখন কিছু ঠিক করতে না পেরে গাজী বাবাজীর কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

—সেখানে গিয়ে লাভ?

—ভাবলাম, গাজীকে গিয়ে সব বলি। সব শুনে গাজী নিশ্চয় বেবীকে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবে। আর গাজীর কথা বেবী কিছুতেই ফেলতে পারবে না। কিন্তু গাজীর কাছে গিয়ে কিছুই বলা হল না। বেবীর প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য অনেক কিছুই আলোচনা হল। ওখান থেকে উঠবার সময় কেবল বলেছিলাম, বাবাজী অনেক দিন তো হল, এবার কিন্তু তোমায় বলতে হবে প্রথম দিন আমায় কি করে চিনেছিলে। উত্তরে বাবাজী হেসে বলল, রোশেনারা মাকে নিয়ে আজ তো কলকাতায় যাচ্ছ, ফিরে এসো সব বলব। গাজীর কথায় বেবী আমার দিকে চাইল, আমিও চাইলাম ওর দিকে।

একটু থেমে শুভ আবার বললে, 'গাজীর ঐটুকু ইঙ্গিতেই কাজ

হল। বেবীকে আর কিছু বলতে হল না, সোজা চলে এল কলকাতায়।'

কথা শেষ করে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল শুভাশিস। আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহল চাপতে পারছি না। একটু অপেক্ষা করে প্রশ্নটা তাই করেই ফেললাম। বললাম, 'তা বেবী তোর কাছে হঠাৎ এভাবে ছুটে গিয়েছিল কেন?'

—উঁ?

ভুরু তুলে আমার দিকে চাইল শুভাশিস। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'আমার কাছে চলে গিয়ে অবশ্য ভালই করেছিল। ওভাবে চলে না গেলে হয়তো একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যেত।'

—কি রকম?

আমার কথার উত্তর দেবার আগে একটা সিগারেট ধরাল শুভাশিস। তারপর গোটা কয়েক টান দিয়ে বলতে শুরু করল বেবীর সেদিনের ঘটনাটা.........

সেদিনের ঘটনার শুরু সালেমা বেগমকে নিয়ে। সালেমা বেগম কিছুদিন হল রোশেনারার বিয়ে দেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। জহিরুলের দূর সম্পর্কের এক ভাইপোর সঙ্গে চলছিল কথা বার্তা। এদিকে রোশেনারার সাফ কথা, বিয়ে সে করবে না। এই নিয়েই মা-মেয়েতে চলছিল মন কষাকষি।

রোশেনারার অফিসে একটা বিশেষ কাজ ছিল সেদিন। তাই অনেক আগেই বেরোতে হয়েছিল ওকে। বাস স্টপ পর্যন্ত এসেই কিন্তু মনে পড়ল, অফিসের একটা জরুরি কাগজ বাড়িতে ফেলে এসেছে। কয়েকবার ইতস্ততঃ করেও শেষ পর্যন্ত কাগজটা আনতে বাড়ি ফিরেছিল সে। বাড়ি ফিরেই ঘটল বিপত্তি।

বাড়ি ফিরে বেশ দ্রুত পায়েই নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। যাবার পথে পাশের ঘর থেকে কয়েকটা কথা ওর কানে ভেসে এলো। কথা ক'টা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রোশেনারা। পাশের

ঘরে তখন জহিরুলের গলা শোনা যাচ্ছে। সে বলছে, 'ও তোমার মেয়ে নয় সালেমা, ও তোমার শত্রু। একটা সাপ। ওকে তোমার আগেই শেষ করে ফেলা উচিত ছিল। যেমন করে পার এই সাপকে এখন ঘর থেকে দূর করে দাও।'

কথাগুলো কানে যেতেই রোশেনারার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কান খাড়া করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল রোশেনারা। জহিরুল বলেই চলেছে, 'সত্যি বলছি, আজকাল ওর চোখের দিকে চাইতে ভয় করে। এমন ভাবে তাকায়। তাই বলছি, তাড়াতাড়ি ওর সাদি দিয়ে দাও। চাপ পড়লেই ঠিক থাকবে।'

—হ্যাঁ ওর ভাব ভাল নয়।

উত্তর দেয় সালেমা।

জহিরুল এবার নীচু গলায় বলে, 'আমার মনে হয়, ও অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে। মনসুরের মৃত্যুর জন্য ও এখন আমাদেরই দায়ী করছে। হয়তো বদলা নেওয়ার জন্য মনে মনে তৈরীও হচ্ছে। বুঝলে সালেমা, আজ হোক, আর কালই হোক ও আমাদের আক্রমণ করবেই।'

—এ্যাঁ, বলো কী তুমি!

সালেমা বেগম যেন আঁতকে ওঠে।

—তাছাড়া ঐ হিন্দু ছোকরাটাও ওর মাথাটা খাচ্ছে। কী পরামর্শ দিচ্ছে কে জানে। আমি অনেকের কাছেই খবর পেয়েছি আজকাল ও প্রায়ই মুর্শিদাবাদ যায়। খোদায় মালুম কেন যায়। এসব করতে ওকে বারণ করে দাও। হিন্দু ছোকরার সাথে এত দোস্তি কিসের? আমার নানা বলতেন, উজবী কভী নেহী গোস্ত্, আওর হিঁদু কভী নেহী দোস্ত। একেবারে হক কথা। তাই বলছি, সালেমা, এখনও সাবধান হও, পরে বিপদ হবে।'

জহিরুলের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে গিয়ে ঢোকে রোশেনারা। রোশেনারাকে দেখে সালেমা বেগম যেন ভূত ছাখে।

চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকায়। আর নিঃশব্দে সালেমার মুখোমুখি দাঁড়ায় রোশেনারা। ওর চোখের দিকে চেয়ে সালেমা বেগম কেমন আর্তনাদ করে বলে ওঠে, 'কী-রে ফিরে এলি যে? তা' ও-ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন? এ্যাঁ, মারবি নাকি তুই?'

কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে চেয়েই রইল রোশেনারা। এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সালেমার দিকে। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, 'আব্বার মৃত্যু হল কি করে?'

—কী সব বলছিস তুই? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

সহজ হবার চেষ্টা করে সালেমা বেগম।

—ঠিকই বলছি। এর জবাব তোমাকে দিতেই হবে।

থম থম করতে থাকে রোশেনারার গলার স্বর।

মা মেয়ের মাঝে এবার এগিয়ে আসে জহিরুল। হালকা গলায় বলতে চেষ্টা করে, 'বেবী কি হয়েছে তোমার? হঠাৎ এসব কথা কেন?'

বারুদের মত জ্বলে ওঠে রোশেনারা। প্রায় চিৎকার করে বলে, 'খবরদার, আমাদের মধ্যে তুমি এসো না। তুমি তৃতীয় ব্যক্তি, বাইরের লোক।'

—কী বললি তুই? তৃতীয় ব্যক্তি, বাইরের লোক!

নিজেকে আর সামলাতে পারেনা সালেমা বেগম। মেয়ের গালে একটা চড় মেরে বসে। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে রোশনারা। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মার ওপর। সমস্ত শক্তি দিয়ে টিপে ধরে সালেমার গলা। সালেমার দম বন্ধ হয়ে আসে। রোশেনারার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। ওর মুখে তখন একটাই প্রশ্ন, 'বলো, আমার আব্বাকে তুমি কেন মারলে?'

সালেমার গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে জহিরুল জোর করে রোশেনারাকে সরিয়ে দিল।

রোশেনারা কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। সালেমা বেগম তখনও কথা বলতে পারছে না। হাঁপাচ্ছে। কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকেই ছুটে এক তলায় নানীমার ঘরে গিয়ে ঢুকল রোশেনারা। নানীমাকে জড়িয়ে ধরে নানীমার বুকে মুখ রেখে বলতে লাগল, 'নানীমা, তুমিই বলো, আমার আব্বাকে ওরা মেরেছিল কিনা। বলো, আব্বার মৃত্যু হল কি করে? আমায় পরিষ্কার করে জানতে দাও।'

রোশেনারার মুখে হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন নানীমা। তাঁর মনে এতদিন যে সন্দেহটা জমাট বেঁধে ছিল রোশেনারার প্রশ্নটা যেন সেখানে গিয়েই আঘাত করল। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলেন না তিনি। নিজেকে সহজ করতে কিছুটা সময় লাগল তাঁর। নিজেকে সহজ করে রেশেনারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কাঁদিস না ভাই, আল্লাহ্‌র জিনিষ, আল্লাহ্‌ই তুলে নিয়ে গেছেন। মানুষের এতে কোনো হাত আছে? কার মৃত্যু যে কি ভাবে হয় কেউ তা' জানে না। কেউ এর উত্তর দিতে পারে না।'

নানীমার কথায় সোজা হয়ে দাঁড়াল রোশেনারা। ওর চোখ যেন জ্বলে উঠল। নানীমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আব্বাকে কারা মেরেছে আমি তা' জানি। তোমায় কিচ্ছু বলতে হবে না। আর এও বলে রাখছি, এর জন্য এক দিন না একদিন তাদের শাস্তি পেতেই হবে।'

সেই মূহূর্তেই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সালেমা বেগম। মাকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল রোশেনারা। মাকে এক রকম ঠেলেই বেরিয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে সালেমা ডেকেছিল কয়েকবার কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেয়নি রোশেনারা।

রাস্তায় বেরিয়েই কিন্তু মনে হল, এবার কোথায় যাবে? অফিস? মনের ওই অবস্থায় অফিস যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে

না। তাহলে? ঠিক তখনই মনে পড়েছিল শুভাশিসের কথা। আর শুভাশিসের কথা মনে পড়তেই সোজা বহরমপুরের পথে।

শুভাশিস থামল। কিন্তু রোশেনারার কথা ভেবে একটা অস্বস্তির কাঁটা আমার মনের মধ্যে বিঁধতে লাগল। সত্যি বড় দুঃখী মেয়েটা। পৃথিবীতে মানুষের সব চেয়ে যে আপন জন, সেই হল ওর সব চেয়ে বড় শত্রু। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পরে। এক দিকে মা, আর একদিকে বাবার হত্যাকারিণী! সব জেনেও দিনের পর দিন অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। কী ভয়ানক শাস্তি! কী নিদারুণ ট্র্যাজেডী!

গল্পে গল্পে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। প্রায় এগারোটা বাজে। শুভর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। তাই বললাম, 'শুভ বেলা কিন্তু অনেক হল।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ভুরু কুঁচকে শুভ বলল, 'মনে হচ্ছে, একটা ইঙ্গিত যেন পেয়েছি।'

—ইঙ্গিত? কিসের ইঙ্গিত?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

—এই যে গাজীবাবাজী, ও নিশ্চয় আমার বাবাকে চেনে। বাবার সংসার ত্যাগের পরই বোধহয় গাজীর সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়।

—হঠাৎ এরকম ধারণা হবার কারণ?

—ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল। কিন্তু এ লাইনে চিন্তা করিনি বলেই এটা ধরতে একটু সময় লাগল। মনটা কেবলই অলৌকিক ব্যাপারের দিকে ঝুঁকতে চাইছিল বলে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। আসলে জটীলতা কিছুই নেই।

আমার কাছে তখনও সবটাই জটীল। শুভাশিসের কথা কিছুই

ধরতে পারছি না। ওর মুখের দিকে চেয়েই রইলাম। শুভাশিস নিজেই বলল, 'বাবাকে দেখলে তোরও বুঝতে অসুবিধে হত না। কেন এত দিন ধরতে পারিনি সেটা ভেবেই অবাক লাগছে।'

—হেঁয়ালি রাখ। ব্যাপারটা খুলে বল।

শুভাশিস একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত মিল। মুখ চোখের মিল তো আছেই এমন কি আমার কপালের এই যে কাটা দাগ দেখছিস বাবারও ঠিক একই জায়গায় এমনি একটা কাটা দাগ আছে। আমার বিশ্বাস, আমার চেহারা দেখেই বাবাজীর মনে হয়েছিল, আমি ওর সেই পরিচিত ব্যক্তির ছেলে। আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে ওর ধারণাটা যাচাই করে নিয়েছিল। আশ্চর্য, এ দিকটা একবারও ভেবে দেখিনি। অথচ কত কী-ই না ভেবেছি।'

চুপ করে কী একটু ভাবল শুভাশিস। তারপর বলল, 'একটা জায়গায় কিন্তু খটকা লাগছে।'

—কি ?

—বাবাজী কিছু বলছে না কেন ? কিসের বাধা ? তাহলে কি বাবা বেঁচে নেই ? আমাকে এটা জানাতে চায় না বলেই কি এড়িয়ে যেতে চাইছে ?

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করতে লাগল শুভাশিস। কতকটা আপন মনেই বলল, 'এবার এর ফয়সালা করতেই হচ্ছে। অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর নয়। আজ রাতেই তাহলে মুর্শিদাবাদ রওনা হতে হবে। তারপর দেখা যাক।'

—আজ রাতেই ? কেন এত তাড়াহুড়োর দরকার কি ? বাবাজী তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না ?

—তা যাচ্ছে না। তবে আমার যেন আর দেরী করতে ইচ্ছে করছে না। মনটা যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাতে পারছি না।

—মাসীমাকে কি বলবি ?

—কিছু না। কাউকেই বলব না। মা জানবে বহরমপুর যাচ্ছি।

কথাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল শুভাশিস। বলল, 'এখন তাহলে চলি, বুঝলি।'

ওকে দেখে মনে হল এখনই মুর্শিদাবাদ রওনা হতে পারলে ও যেন বাঁচে। ওর ঐ উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা দেখে আমার মনে হল, রোশেনারার সাথে ওব সম্পর্কের গভীরতাই যেন ওকে ওর বাবার জন্য ভাবিয়ে তুলেছে। বাবার প্রতি রোশেনারার শ্রদ্ধা-ভালবাসার দিকটা শুভ-র কাছে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততই যেন ও নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে। একটা অপরাধ-বোধ ওকে চঞ্চল করে তুলেছে। কেবলই মনে হয়েছে, বাবার কাছে যদি একবার ক্ষমা চেয়ে নিতে পারত ! আজ সেই সুযোগটাই যেন সামনে এসে হাজির। তাই ওব এই অস্থিরতা। সামান্য একটু দেরী, অথবা কোনো অসাবধানতায় এই সুযোগ যদি হারিয়ে যায় ! তাই এত উদ্বেগ।

শুভাশিসের সঙ্গে আমিও উঠলাম। রাস্তায় বেরিয়ে বললাম, 'তা বেবীকে কিছু বলে যাবি না ?'

—হুঁ, সেই কথাই ভাবছি। একবার খোঁজ নেওয়া দরকার, অফিসেই একটা ফোন করে দেখব।

খানিকটা হেঁটে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ভাল কথা, ছোটমাসী তোকে একবার দেখা করতে বলেছে।'

—কেন ?

—তা জানি না।

চুপ চাপ আরও খানিকটা পথ হাঁটলাম আমরা। শুভ-র কাছ থেকে এবার বিদায় নিয়ে ফিরব। এমন সময় দেখি, রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে হন হন করে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে রোশেনারা। আমরা ওর দিকে চাইতেই হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। ওকে দেখে

শুভাশিস বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই বল উঠল, 'ব্যাপার কি? বাড়িতে কিছু হয়নি তো।' সে সন্দেহটা আমার মনেও উঁকি মারছিল।

রোশেনারা কাছে এলো। ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, সারা রাত যেন ঘুম হয়নি। মুখ শুকনো, চোখ বসা। একটা উদ্বেগের ছাপ ওর সমস্ত মুখে-চোখে। রোশেনারা আমার দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। তাবপব শুভাশিসের দিকে চেয়ে বললে, 'তোমাব কাছেই আসছিলাম।'

—আমি এখানে আছি তা' জানলে কি করে?

—ওটা আমার অনুমান। আজ সকালেই যে রথীর কাছে আসবে এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম। এবং তুমি এলে রথীর যে অফিস যাওয়া হবে না সেটাও প্রায় জানা ছিল।

কথাটা শেষ করে আমার দিকে চেয়ে হাসল রোশেনারা। আমিও হেসে বললাম, 'কিন্তু আর একটু হলেই সব গুবলেট করে ফেলেছিলে। আর সামান্য দেরী করলেই শুভকে আর পেতে না।'

—সেটা ঠিক।

—তা' চলো না আমার ঘরে গিয়ে আবার আড্ডা জমানো যাক।

—না তার দরকার হবে না হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলা যাবে।

আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

একটুকাল চুপ করে থেকে রোশেনারা বললে, 'ও-বাড়িতে একটা রাত্তিরের জন্যেও আমার আর থাকা সম্ভব নয়। আজকের মধ্যেই একটা হোস্টেল-টোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্যই তোমার কাছে এলাম।'

—কেন আবার কি হল?

—কিছুই না। তবু ওখানে থাকতে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছি। কিছুদিন অন্ততঃ বাড়ির বাইরে না থাকলে চলবে না।

—কিন্তু আজ যে আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি।

—তার মানে? আজই চলে যাচ্ছ তুমি? আমায় বল নি তো?

রীতিমত অবাক হল রোশেনারা। একটু ক্ষুণ্ণও হল।

—গাজীবাবাজীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

—হঠাৎ?

শুভাশিস রোশেনারার মুখের দিকে একবার আড় চোখে চাইল। তারপর সংক্ষেপে ওর যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করল। সব শুনে রোশেনারা কেমন একটু আবদারের সুরেই বলল, 'তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

—তুমি! তুমি কেন যাবে?

—আপত্তি করো না শুভ। তোমার এ-যাত্রায় আমাকেও সঙ্গে নাও। আমার মন বলছে, তুমি সফল হবে, তোমার বাবার খোঁজ পাওয়া যাবে। তোমার সঙ্গে আমায় থাকতে দাও শুভ।

রোশেনারার কণ্ঠে আকুতি।

শুভাশিস আর 'না' বলতে পারল না। চুপ করে একটুকাল ভাবল। তারপর বলল, 'বেশ চলো।' রোশেনারার মুখে হাসি ফুটল!

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, এবার আমাকে ফিরতে হবে। মিছিমিছি আর বেলা করে লাভ নেই। ঠিক তক্ষুনি রোশেনারা বলল, 'গতকাল বাড়ি ফিরে সামসুল ভাই-এর একটা চিঠি পেলাম।'

—কার চিঠি!

আমি আর শুভাশিস দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম।

রোশেনারা ওর ব্যাগ থেকে খাম শুদ্ধ একটা চিঠি বার করে শুভাশিসের হাতে দিয়ে বলল, 'সামসুল ভাই-এর চিঠি। গতকাল লেখা।' অনেক ঘুরে পরশু ঢাকা পৌঁছবে। হঠাৎ ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে, তাই কেউ হয়তো চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে। তোমার ঠিকানা মনে নেই বলে আলাদা চিঠি দিতে পারেনি। তোমাদের সকলের কথাই লিখেছে। পড়ে ছাখো।'

শুভাশিস হাঁটতে হাঁটতেই চিঠিটা পড়ে ফেলল। মনে মনেই

পড়ল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কয়েকটা সাংঘাতিক কথা লিখেছে দেখছি। যা ভেবেছিলাম তাই। ওপার বাংলায় পালা বদল হতে যাচ্ছে। এ-ধরণের চিঠি সরকারের আটকে দেওয়ার কথা।

—কেন কি এমন লিখেছে?

—কয়েকটা জায়গা পড়ে শোনাচ্ছি, শুনলেই বুঝতে পারবি।

শুভাশিস পড়তে লাগল, "·······তোমাদের কাছে আর কোনোদিন যেতে পারব কি না জানি না। কারণ নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস হয়তো তার আগেই আমাকে এবং আমার মত আরও অনেককে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। তা' দিক। আমরা জানি, আমাদের কাজ কোনো দিন পড়ে থাকবে না। কাজ এগিয়েই যাবে। আমাদের মত কয়েকশো জনকে ওরা হয়তো শেষ করবে; কিন্তু এই কাজ সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সালাম-বরকতরা চলে গেছে, তাই বলে কি ওদের কাজ থেমে থেকেছে? থাকেনি।. কোনোদিন তা থাকে না।······ রক্ত! ওরা আমাদের রক্ত ঝরাতে চাইছে। ঝরাক। আমরা জানি আমাদের রক্তে শ্যামল বাংলা আরও শ্যামল হয়ে উঠবে। শুভদের বলো, এমন একটা দিন আসবে যেদিন কবির আক্ষেপের পালা শেষ হবে। সাত কোটী সন্তান কেবল বাঙালীই থাকবে না, মানুষও হবে। তা' দেখে গোটা পৃথিবী সেদিন অবাক হয়ে যাবে। তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, সেই দিনটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি যেন তোমাদের থাকে।··· ··তুমি এবং শুভাশিস। বিশেষ করে তোমাদের দু'জনকে একটা কথা বলি, তোমাদের ওপর আমার অনেক আশা। আমার বিশ্বাস, তোমরা হয়তো গোটা বাংলাকে এক নতুন আলো দেখাতে পারবে।········· আর একটা কথা। ওপার বাঙলায় বসে এপার বাঙলার কথা

তোমরা যেন ভুলে যেও না। তাহলে সেটা আত্মপ্রতারণার নামান্তর হবে। এপার বাঙলায় যখন সূর্যোদয় ঘটবে তার আলো ওপার বাংলায়ও পড়বে। সূর্যোদয়ের আর বেশী দেরী নেই, তোমরা প্রস্তুত থেকো। ...... ঠিকানা দিলাম না। আজ আমার আলাদা কোন ঠিকানা নেই। গোটা বাংলাই আমার ঠিকানা...... ।"

পড়া শেষ করে শুভাশিস বলল, 'চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে না, ওপার বাংলায় একটা বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে?'

—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি এমন হতে পারে?

আমার কথার উত্তরে শুভাশিস বলল, 'একমাত্র ভবিষ্যতই তা' বলতে পারবে।'

রোশেনারা কতকটা অন্যমনস্কের মতই বলল, 'সামসুল ভাই অদ্ভুত ধাতুতে গড়া! খাপ খোলা তলোয়ার যেন।'

শুভাশিস আর কোনো কথা বললে না। আমিও চুপ করেই রইলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

॥ সাত ॥

খাওয়া-দাওয়া সেরে ছুটির সময় ধাওয়া করলাম ব্রততীর অফিসে।

ওর অফিসে ঢুকে দেখি, ব্রততী কাজের মধ্যে ডুবে আছে। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চাইল। ওর দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। সঙ্কোচের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় ডেকেছিলে? মানে শুভ বলছিল—।'

আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ইঙ্গিতে আমায় বসতে বলল ব্রততী। তারপর ফাইলে দৃষ্টি রেখেই বলল, 'একটু বসো হাতের কাজটা সেরে নিয়েই বেরোব।'

হাতের কাজ শেষ করে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে রাখতে বেশ খানিকটা সময় গেল। তারপর এক সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম আমরা। বেরিয়ে ব্রততী কিন্তু একটা কথাও বললে না। দারুণ গম্ভীর মনে হল ওকে। নিঃশব্দেই খানিকটা পথ হাঁটলাম।

—তুমি আজকাল আমায় এড়িয়ে চলতে চাইছো কেন বলতে পার? পথের ওপর চোখ রেখেই এক সময় বলে উঠল ও।

ব্রততীর এই অদ্ভুত অভিযোগটা কানে যেতেই পথ থেকে চোখ সরিয়ে এনে ওর মুখের দিকে চাইলাম। ওর মুখখানা তখন থম থম করছে। হঠাৎ ওর এই ভাবান্তরে একটু অবাকই হলাম।

ওর চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম আমি, 'কেন? তোমায় আমি এড়িয়ে চলবো কেন?'

ব্রততী অন্য দিকে চেয়ে বললে, 'নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করো না রথী দা।'

—কী মুস্কিল! কেন তোমায় এড়িয়ে চলবো বলতে পার?

—সে তুমিই জান।

—না আমি জানি না।

বেশ জোর দিয়েই বললাম কথাটা।

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ব্রততী আবার আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। আশ্চর্য, ওর চোখ দুটো কখন জলে ভরে এসেছে। মুখটা কেমন লাল। সূর্যাস্তের রাঙা আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর সারা মুখে। থর থর করে কাঁপছে ওর ঠোঁটজোড়া। একটা কথাও বলল না ও, একবার চেয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

ওর চোখের দিকে চেয়ে আমার কি হল জানিনা, বুকটা হঠাৎ কেমন তোলপার করে উঠল। একটা সম্পূর্ণ অজানা অনুভূতি ছেয়ে ফেলল আমার মনটাকে। যেন নিজের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

—ব্রতী! ব্র!

নিজের অজান্তেই ওর ছেঁটে দেওয়া নামটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। এই প্রথম। এনাম ধরে এর আগে ওকে কখনও ডাকিনি। এই প্রথম ডাকলাম। একটু আগেও ভাবি নি, ওকে কখনও এভাবে ডাকব। তাই অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কেমন একটা অস্বস্তি।

আমার ডাকটা শুনেই ব্রততী কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চেয়েছিল আমার দিকে। একটা উত্তেজনায় ওর নাকের পাটাজোড়া ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরছে দাঁত দিয়ে। উদ্গত কান্নাকে সংযত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু না শেষ পর্যন্ত পারল না। দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি অসহায় ভাবে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

কয়েকটা সেকেণ্ড। কয়েকটা সেকেণ্ডের মধ্যেই ব্রততী নিজেকে সংযত করে নিল। চোখ মুছে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'দেখছো তো, শুভ মামা আমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও দূরে সরে যাবে। তখন হয়তো ওর আর নাগালই পাব না।'

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বললে, 'কিন্তু বথীদা, তুমি যেন এমনি করে কখনও দূরে সরে যেওনা। কথা দাও কখনও যাবে না।'

ওর করুণ তুটো চোখ স্থির হয়ে রইল আমার মুখের ওপব। কিন্তু এব কি উত্তর দেব আমি? ভাষা দিয়ে মনের কথা কতটুকু বোঝাতে পারব? কতটুকু বোঝাতে পারা যায়? কতটুকু বোঝানো সম্ভব? মুখ দিয়ে কেবল অস্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে এল, 'ব্রতী— আমি—।' কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। ওর মুখেব দিকে চেয়েই রইলাম। ব্রততী কি বুঝল জানি না। ওর ঠোঁটেব কোণে এক টুকবো হাসি ফুটে উঠল।

আমরা রেড রোড ধরে এগিয়ে চলেছি। চলেছি তো চলেইছি। আমাদের যেন নিরুদ্দিষ্টের পথে যাত্রা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কেবল নিঃশব্দে এগিয়ে চলা।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বললাম, 'শুভ আজ মুর্শিদাবাদ যাচ্ছে।'

—আজ যাচ্ছে? কিন্তু আজ তো যাওয়ার কথা নয়।

—কথা ছিল না। হঠাৎ ঠিক করেছে। সকালে আমার ওখানে বসেই যাওয়া স্থির করেছে।

—কেন? হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন পড়ল?

—সে অনেক কথা। চলো আগে কোথাও গিয়ে বসি, তারপর সব বলছি।

তুজনে গিয়ে মনুমেণ্ট ময়দানে ঘাসের ওপর বসলাম। ব্রততী কোলের ওপর নিজের ব্যাগটা রেখে পরিপাটি করে বসল। তারপর বলল, 'এবার বলো।'

ব্রততী কিছুই জানে না। তাই গতকাল ওদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখা থেকেই শুরু করতে হল। গত কালের ঘটনা থেকে শুরু করে শুভাশিসের মুখে শোনা সমস্ত ঘটনা একটু একটু করে বললাম ওকে। বোশেনাবার সঙ্গে আজ সকালে যে দেখা হয়েছিল তাও বললাম।

সব শুনে চুপচাপ বসে রইল ব্রততী। বসে বসে কি ভাবল সেই জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এক সময় বলল, 'এমন আঘাতও মানুষকে সইতে হয়। আশ্চর্য! নিজের মা সেই কিনা— । সত্যি ব্যাপারটা ভাবা যায় না।'

একটু থেমে আবার বললে, 'মানুষ চেনা কত শক্ত। এই বেবীর মাকে কী ভালই না মনে হয়েছে!' তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তাহলে ওরা আজই মুর্শিদাবাদ যাচ্ছে?'

- হ্যাঁ।

—আমরাও তাহলে আজ রাত্রের ট্রেনেই যাচ্ছি।

—তার মানে?

ওর কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমার চোখের দিকে চাইল ব্রততী। একটুকাল চুপ করে থেকে বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? গাজী-বাবাজী। এতদিন পর জামাই বাবুর হঠাৎ খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা। ওদের তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদ যাওয়া। সবকিছু এক সঙ্গে যেন মেলাতে পারছি না।'

—তুমি তাহলে এসব বিশ্বাস করছো না?

—ঠিক তা' নয়। আমি নিজের চোখে সব কিছু যাচাই করে দেখতে চাইছি। এক কথায় সব কিছু বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ওদের পিছু ধাওয়া করতে হবে।

ওর কথায় একটু অবাকই হলাম। এ যেন সেই আগের ব্রততী নয়। এখন আর সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। বিশ্বাস

করার আগে বাজিয়ে দেখতে চায়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল ব্রততী, 'কি আমার সঙ্গে তুমি যাবে না ?'

—তুমি গেলে আমায় যেতেই হবে।

আমার কথায় ব্রততী হাসল। আমি বললাম, 'দিদিকে কী বলবে ?'

—সে ম্যানেজ করে নেব। কিন্তু আর বসে থাকলে চলবে না। এবার ওঠো। যেতে হলে সামান্য গোছগাছ তো করতে হবে।

অতএব উঠে পড়লাম আমরা।

শুভ-র মার কাছে শুনলাম, শুভ দুপুরেই বেরিয়ে গেছে। দিদির সামনে ব্রততী কেমন উসখুস করতে লাগল। কি করে কথাটা পারবে ভেবে পেল না। কিছুটা সময় এ-কথা সে-কথার পর কতকটা মরীয়া হয়েই বলল, 'দিদি আমার একটা কথা রাখবে ?'

—কি কথা ?

—একটা রাতের জন্য তোমাকে বাড়িতে একা থাকতে হবে।

—তার মানে ?

—তার মানে একদিনের জন্য আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। বিশেষ প্রয়োজন। তুমি 'না' বলো না, দিদি। লক্ষ্মীটি।

ব্রততীর কথায় গম্ভীর হয়ে গেলেন শুভ-র মা। গম্ভীরভাবেই বললেন, 'কোথায় যাবি, কেন যাবি, এ-সব না বললে আমি কিছুই বলতে পারব না।'

ব্রততী এবার দু'হাত দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দিদি লক্ষ্মীটি, বেশী প্রশ্ন করো না। কেবল এইটুকু জেনে রাখো, তোমার আমার সকলের ভালোর জন্যেই আমার যাওয়া।'

—তা হোক, তবু তোকে বলতে হবে। কিছু না জেনে তোকে আমি ছাড়তে পারব না।

ব্রততী একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আজ রাতের ট্রেনে মুর্শিদাবাদ যাব। সঙ্গে রথীদাও যাচ্ছে।'

—তোরাও মুর্শিদাবাদ? ব্যাপার কি তোদের?

চোখ বড় বড় করে চাইলেন শুভ-র মা।

—লক্ষ্মী দিদি আর কোনো প্রশ্ন করো না। আমাদের যেতে অনুমতি দাও।

শুভ-র মা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বেশ যা। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সঙ্গে তুমি যাচ্ছ এইটেই মস্ত বড় ভরসা।'

সেই রাত্রে নয় পরের দিন রাত্রের ট্রেনে রওনা হলাম আমরা। বুকে আশা-নিরাশার দোলা নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

॥ আট ॥

ভোরে গিয়ে পৌঁছলাম মুর্শিদাবাদ। তখন কাক-ডাকা ভোর। স্টেশনেই মুখ হাত ধুয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। একটা রিক্সা ওয়ালাকে গাজী বাবাজীব কথা বলতেই চিনতে পারল। নিজেই সে বললে পথ খুব একটা দূর নয়। ভাগীরথীর ধার দিয়ে এগোলেই পাওয়া যাবে গাজী বাবাজীব আস্তানা। অতএব আর বাক্য ব্যয় না করে উঠে পড়লাম রিক্সায়। রিক্সা যাত্রা শুরু করল আমাদের নিয়ে।

ভোরের মিষ্টি বোদ তখন গাছেব মাথায় মাথায়। চারপাশে পাখীর কলবব। শিব শিব করে বইছে হাওয়া। বাতাসে কেমন একটা মিঠে গন্ধ। বড় বড় গাছেব ছায়া বিছোনো পথ বেয়ে চলেছে আমাদেব বিকসা। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক আমেজ।

ফাঁকা পথ। বিকসা বেশ জোবেই চলেছে। গাছের পাতায় হাওয়া লেগে যে-শব্দ উঠছে সে শব্দটা যেন কানেব পাশ দিয়ে হিস হিস করে ছুটে চলেছে। শব্দটা শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল, কারা যেন ফিস ফিস করে আমার কানের কাছে কথা বলছে। স্পষ্ট কোনো কথা নয়। এক সঙ্গে অনেকের ফিস্ ফিসানি। ভয় আর আতঙ্কে তাদেব গলার স্বর যেন কাঁপছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি। আনমন ভাবেই চাবপাশটা ভাল করে চেয়ে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। ভাল করে কান পাতলাম। একইভাবে ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস কবে চলেছে কারা। স্পষ্ট মানুষের কণ্ঠস্বর! মনে মনে অবাক হয়ে ভাবি, কাদের এ কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে? কাবা এমনি কবে আতঙ্কেব মধ্যে দিন গুনছে? আমার মনে হতে থাকে, কারা যেন করুণ কণ্ঠে বলছে, 'আমরা সেই

অত্যাচারিত মানুষের আত্মা। আমরা কত মানুষের কানে কানে শুনিয়েছি আমাদের অত্যাচারের কাহিনী। সেই মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই শুনিয়ে আসছি। ভয়ে কখনও চিৎকার করে বলতে পারিনি, ফিস ফিস করে শুনিয়েছি। কিন্তু কেউ শোনেনি আমাদের কথা, শুনতে চায়নি। না শুনুক, তবু আমরা দিনের পর দিন শুনিয়ে যাব মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার আর উৎপীড়নের কাহিনী। একদিন না একদিন সবাইকে তা শুনতেই হবে।'

স্পষ্ট। অত্যন্ত স্পষ্ট সব কথা। একটু যেন চমকেই উঠি। অবাক হয়ে ভাবি, এ-ও কি সম্ভব? হাওয়ায় কি মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা থাকে? নাকি আমার মনের ভুল? কিন্তু এত স্পষ্ট?

—রথীদা, আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলল ব্রততী।

—ভয়! কিসের ভয়?

—কী জানি! মনে হচ্ছে, কারা সব ফিস ফিস করে কথা বলছে।

ব্রততীর কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না। ভাবি, দু'জনের কি একই রকম ভুল শোনা সম্ভব? কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ না করে বললাম, 'ধ্যেৎ ও-তো গাছের পাতার শব্দ। তোমার মনের ভুল।'

ব্রততী আর কোনো কথা বলল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি চাইলাম ভাগীরথীর দিকে। চরা-পড়া, মরা ভাগীরথী। কেনোক্রমে থির থির করে বয়ে চলেছে। নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস যেন। ভাগীরথীর দিকে চেয়ে আমার মনে হল, ইতিহাসের হাজার হাজার মানুষের ব্যথাই যেন জমাট বেঁধে ভাগীরথীর স্রোতকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের কাহিনীই যেন ভাগীরথীর বুকে পলিমাটির রূপ নিয়েছে। নদীর বুকের চরা যেন লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরব প্রতিবাদ।

—আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি তো ?

আবার প্রশ্ন করল ব্রততী। রিকসা ওয়ালাই তার জবাব দিলে, 'পথ ঠিকই আছে দিদি। আর বেশী দূর নেই। আমরা প্রায় এইসে গিয়েছি।'

আর খানিকটা পথ এগোতেই দেখি, উল্টো দিক থেকে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে একটি লোক। দূব থেকে লোকটিব অদ্ভুত পোষাক দেখে সন্দেহ হল, হয়তো বা এই সেই গাজী বাবাজী। আমাদের রিকসা ওয়ালাও বলে উঠল, 'বাবু ঐ আপনাদেব গাজী বাবাজী আইসছে।'

লোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম, শুভ-র বিবরণেব সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। গায়ে নানা রঙের কাপড়ের তৈরী আলখাল্লা। মাথায় পাগড়ি, এক হাতে একতারা, আর এক হাতে চামর। একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে লোকটি।

রিকসাওয়ালা রিকসা থামিয়ে গাজী বাবাজীকে উদ্দেশ্য কবে বলল, 'ও গাজী বাবা, এই বাবু মশায়রা তোমাব কাছেই যেইছে যে গো।'

গাজীবাবাজী কাছে আসতে আমরাও রিকসা থেকে নেমে পড়লাম। গাজীবাবাজী কাছে এসে এক গাল হেসে বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'তা বাবুমশায়দের কোতি হনে আসা হলছে বটে ?'

—আসছি কলকাতা থেকে। একটা বিশেষ দরকার।

—কি দরকার বটে ?

গাজীবাবাজী আমার চোখের দিকে সোজা চেয়ে রইল। চোখ দুটো যেন দুষ্টুমিতে ভরা। আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার আপনার কাছে আসবার কথা ছিল। আমরা তাঁদের খোঁজেই আসছি। ভদ্রলোকের নাম, শুভাশিস।'

—অ্যাই দ্যাখো, তারা তো কাল চল্যে গিয়েছে গ।

ভুরু নাচিয়ে বলল গাজীবাবাজী।

—চলে গেছে? কোথায় চলে গেছে?

বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করল ব্রততী।

গাজীবাবাজী ব্রততীর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুকাল। কী একটু ভাবল। তারপর হেসে বললে, 'যেছে বহরমপুর। সিখান থেকে যাবে তারাপীঠ'

—তারাপীঠ! কেন সেখানে কি?

—তারাপীঠ যে ওদের টাইনছে গ। না গিয়ে কইরবে কি?

হেঁয়ালী করে উত্তর দেয় গাজীবাবাজী। আমার সন্দেহ হল, গাজী হয়তো বুঝতে পারে নি আমরা কাদের খুঁজছি। ভাবলাম ও হয়তো অন্য লোকের কথা বলছে। তাই বললাম, 'আমরা কাদের খুঁজছি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো?'

—পেইরেছি বৈকি! খুব বুইঝেছি। আরে অদের একবার দেইখলে কি আর ভোলা যায়? অদের দেইখলে মনে লয়, কাশী আর কাবা এক হইয়ে যেইছে। দেইখলে মনটা ভইরে ওঠে হ্যা। আর ঐ মেইয়ে!

আমাদের দিকে পিট পিট করে তাকায় গাজীবাবাজী। তারপর একতারায় সুর তুলতে তুলতে বলে, "তাকে দেইখলে মনে লয়, সে যেন কেবলই বইলছে—

পিরিতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নাম্বিলু তায়
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥"

একতারা বাজিয়ে দুলে দুলে গাইতে লাগল বাবাজী। রিকসা ওয়ালা হেসে বলল, 'গাজীবাবা বেশ আছে।'

কিন্তু ব্রততী ধৈর্য ধরতে পারে না। তাড়াতাড়ি বললে, 'ওদের তারাপীঠ যাবার তো কথা ছিল না। সেখানে কেন যাবে?'

ব্রততীর কথায় গাজীবাবাজী গান থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। কী একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তোমবা অদের কে হও জানিনে, তবে বুইঝতে পারছি কাছের মানুষ। তাই তোমাদের বলি।'

একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'ইন্দ্র ঠাকুরকে চেনো?'

—হ্যাঁ। তিনি আমার জামাইবাবু।

উত্তর দিলে ব্রততী।

—অ মাসী। তাহলে বলি শোনো।

গাজীবাবাজী ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'ইন্দ্র ঠাকুর সংসার ছেইড়ে যখন হেথা-হোথা ঘুইরছে তখন তার সাথে আমার পরিচয়। আমিও ঘুরি সেও ঘোরে। তা' একবার তার খুব অসুখ হল্য। সেবা যত্ন কইরে গুরুব কৃপায় ভাল কইরে তুললাম। তারপর তুজনায় খুব ভাব হইয়ে গেল। তুজনে কত জায়গায় ঘুইরলাম, কত দেশ-বিদেশে। ঘুইরতে ঘুইরতে ঠাকুর একদিন বইললে, গাজী এমন করে ঘুইরতে আর মন মাইনছে না। তারা মার কাছে না যেইলে মন শান্তি পাচ্ছে না। তাই ঠাকুর গেল তারাপীঠ। আর আমি ঘুইরতে লাগলাম পথে পথে। ঠাকুর এখনও তারাপীঠেই রইয়েছে। বলা বারণ ছিল তাই এতদিন বলি নাই। কিন্তু হালে ঠাকুরের মন ছেলের জন্য চঞ্চল হইয়ে উইঠেছে। তাই বইলে দিলাম। গুরু জানে, ভাল কইরলাম কী মন্দ কইরলাম।'

—কিন্তু ইন্দ্র ঠাকুরের ছেলেকে আপনি চিনলেন কি করে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেললাম।

—হ্যাই গ্যাখো, বাপ-ব্যাটার মুখ যে এক ছাঁচে গড়া হ্যা। চিনতে কি ভুল হয়?

বাবাজীর চোখ তুটো অকারণেই কেমন সজল হয়ে এলো।

—রথীদা এবার তাহলে বহরমপুর চলো। ওদের সাথে আমরাও তারাপীঠ যাব।

আমাকে তাড়া দেয় ব্রততী।

অতএব গাজীবাবাজীর কাছ থেকে এবার বিদায় নিতে হল। কতকটা আশীর্বাদের ভঙ্গীতেই সে বলল, 'গুরু তোমাদের মঙ্গল করুন।'

বহরমপুর পৌঁছে ভাবলাম, এলাম তো কিন্তু ওদের খুঁজব কোথায়? ভেবে চিন্তে প্রথমেই গেলাম বাস স্ট্যাণ্ডে, ওদের পাওয়া গেল না। তাহলে?

—চলো না শুভমামার মেসটা খুঁজে বার করি। ওরা হয়তো ওখানেই আছে।

ব্রততীর কথা মত খুঁজে খুঁজে মেসে গিয়ে হাজির হলাম। নাঃ, সেখানেও নেই। ব্রততী কিন্তু নাছোড বান্দা। খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কাজেই আরও অনেক পথ ঘুরতে হল। খানিকটা পথ হেঁটে, খানিকটা রিকসায় করে গোটা শহরটাই চষে ফেললাম আমরা। কিন্তু ওদের দেখা মিলল না।

ব্রততীর দিকে চেয়ে বুঝলাম, ঘুরতে ঘুরতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারা রাত ট্রেনে প্রায় জেগেই কেটেছে। সকাল থেকে এক কাঁপ চা ছাড়া পেটে কিছুই পড়ে নি। এদিকে মনের মধ্যে রয়েছে একটা উদ্বেগ। সকাল থেকে এত ছোটাছুটি। সব মিলিয়ে ক্লান্তিতে ব্রততীর মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

—এভাবে ঘুরে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

বললাম আমি।

—লক্ষ্মীটি, আর একটু ভাল করে খুঁজে দেখি। এবার হয়তো পেয়েও যেতে পারি। ওদিকে যাওয়ার বাস ছাড়তে তো এখনও দেরী আছে, ওরা নিশ্চয়ই এখানেই কোথাও আছে।

—ওরা যদি ইতিমধ্যে অন্য কোনো ভাবে চলে গিয়ে থাকে? মিছিমিছি এভাবে ঘোরাঘুরির কোনো মানে হচ্ছে না।

। আর একটু দেখবো। এবার না পেলে তোমাকে

আর বিরক্ত করব না।

ব্রততী ওর একটা হাত আমার হাতের ওপর রাখল।

—বেশ তাহলে চলো, আর একটু দেখা যাক।

এলোমেলো আরও খানিকটা হাঁটা হল। কোথাও ওদের পাওয়া গেল না। পাওয়া যে যাবে না সে বিষয়ে আমার অবশ্য কোনো সন্দেহই ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম রাধাঘাটের কাছে। একটু আনমনা ভাবেই হাঁটছি। হঠাৎ ব্রততী প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'রথীদা, দ্যাখো দ্যাখো, ঐযে ওরা ওখানে।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। শুভাশিস আর রোশেনারা নদীর দিকে চেয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে পেছন থেকে আস্তে ডাকলাম, 'শুভ।'

দুজনে প্রায় একসঙ্গে চমকে উঠল। পেছন ফিরে আমাদের দেখে অবাক। শুভাশিস কেমন হতভম্ব হযে জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে ব্যাপার কি? হঠাৎ তোরা?'

সব কিছু বলতে গেলে অনেক কথা। আমি অত কথায় না গিয়ে ছোট্ট করে বললাম, 'ব্র তোর এখানে আসতে চাইল তাই—।'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চাইল শুভাশিস। ব্রততীকে আমি যে 'ব্র' বলে সম্বোধন করলাম, এটা হয়তো ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। হযতো তাই আমার দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। কী বুঝল ও-ই জানে।

ব্রততী এগিয়ে গেল রোশেনারার দিকে। ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। রোশেনারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ ব্রততীর এই উচ্ছ্বাসে একটু যেন বে-সামাল হয়ে পড়ল। ব্রততীর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। রোশেনারার হাত দুটো ধরে বলতে লাগল, 'বেবী, তোর সব কিছু আমি জানতাম না। তাই হয়তো তোকে ঠিক বুঝতেও পারিনি। অনেক অন্যায় ব্যবহার

করেছি। তুই আমায় ক্ষমা কর।'

রোশেনারার চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল। ব্রততীর কথার উত্তরে কী একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। কেবল ওর ঠোঁট জোড়া একটুখানি কেঁপে উঠল। ব্রততী প্রায় ফিস ফিস করে আবার বলল, 'ক্ষমা করলি তো?'

—অন্যায় ব্যবহার তো আমিও করেছি ব্রতী। আমার অভিমানটাকেই বড় করে দেখেছি, তোর দিকটা একবারও ভেবে দেখিনি। আমাকেও ক্ষমা চাইতে হবে।

রোশেনারার কথায় হেসে ফেলল ব্রততী। হাসতে হাসতেই বলল, 'তাহলে শোধ-বোধ।'

—হ্যাঁ, শোধ-বোধ।

রোশেনারাও হাসল।

ব্রততী শুভাশিসের দিকে চেয়ে এবার বলল, 'শুভ মামা, আমরাও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

—তোরা? তোরা কোথায় যাবি?

—তারাপীঠ। গাজীবাবাজীর কাছ থেকে সব শুনে এসেছি।

—না তা হয় না। ওখানে ক'দিন থাকতে হবে, ওখান থেকে আবার কোথাও খোঁজ করতে যেতে হবে কিনা, কিছুই ঠিক নেই। ওদিকে মা বাড়িতে একা। না তোর যাওয়া হতে পারে না। এ-ভাবে তোর আসাটাই ঠিক হয় নি।

শুভাশিসের কথায় ব্রততী বেশ দমে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি একা—।' কথাটা কিন্তু শেষ করতে পারল না।

রোশেনারা ব্রততীর কাঁধের ওপর আলতো করে একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'মনে হচ্ছে, এবার তোর জামাইবাবুর খোঁজ পাওয়া যাবে। তুই নিশ্চিন্ত থাক।' একটু থেমে আবার বলল, 'শুভর মনে একটা অপরাধ বোধ দানা বেঁধে আছে। ওর বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে ও অনেকটা শান্তি পাবে।'

—আমি তা' জানি। সেই জন্যেই তো ওকে একা ছাড়তে—।

—একা কোথায়? আমিও তো সঙ্গে রইলাম।

একটু হেসে বলল, 'আমাকে তুই ভয় করিস না।'

—ভয়? কিসের ভয়?

—শুভকে নিয়ে। আসলে শুভ-র সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি রকম জানিস? নদীর স্রোতের সঙ্গে তার তীরের যা সম্পর্ক তা-ই। দুয়েরই পৃথক সত্তা আছে, তবু দুটোকে নিয়েই পূর্ণতা। দুটোকে নিয়েই নদীর অস্তিত্ব। আমাদেরও তেমনি। আমরা পৃথক হয়েও এক, আবার এক হয়েও পৃথক। দু'জনকে নিয়েই এক পূর্ণ জীবন।

একটু হেসে বলল, 'কথাগুলো একটু কাব্যিক হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু এটাই আমাদের সত্য পরিচয়।'

ব্রততী কোন উত্তর দিল না। কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল রোশেনারার দিকে। দু'চোখ ভরে যেন দেখতে লাগল ওকে। আমিও রোশেনারার দিকেই চেয়েছিলাম। শুভাশিসের দৃষ্টিও রোশেনারার ওপর স্থির হয়ে আছে। ওর চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কারও মুখে কোন কথা নেই।

তিনজনের দৃষ্টির সামনে রোশেনারা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। লজ্জায় আনন্দে ওর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আবেগ মেশানো গলায় বললে, 'একী তোমরা সবাই আমার দিকে এভাবে চেয়ে রইলে কেন? বা-রে।'

—তোমায় দেখছি। দেখছি তুমি কত বড়! বললাম আমি।

—বা-রে বেশ মজা তো! সবাই মিলে—বারে।

রোশেনারার চোখে জল টলমল করতে লাগল। সেই সঙ্গে ওর মুখে হাসি ফুটল। শিশির বিন্দুর ওপর যেন ভোরের আলো পড়ল।

ঠিক হল, ওরা যাবে তারাপীঠ আর আমরা ফিরব কলকাতায়।

অল্পক্ষণ পরেই ওদের বাস। বাস ছাড়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই রইলাম। বাস ছেড়ে যাবার পর আমরাও পা বাড়ালাম একটা হোটেলের দিকে। খাওয়া এবং বিশ্রামের বড় প্রয়োজন তখন।

রাত্রের ট্রেনেই ফেরা স্থির হল। সারা দিনটা এটা ওটা দেখেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। ব্রততী অবশ্য সমস্ত দিন খুব কমই কথা বলল।

তখন সন্ধ্যো। গঙ্গার ধারে আমরা দুজন বসে আছি। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে ব্রততী এক সময় বলল, 'রথীদা আজ কিন্তু আমাদের কলকাতা যাওয়া হচ্ছে না।'

—কেন?

ওর কথায় অবাক না হয়ে পারি না।

—কাল সকালে তারাপীঠ যেতে হবে।

বেশ সহজ ভাবেই বলল ব্রততী।

—তার মানে?

ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্রততী বলল, 'না, এ-ভাবে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। ফিরে গিয়ে দিদিকে কি বলবো? সত্যি মিথ্যে কোনোটাই বলা যাবে না। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার চেয়ে তারাপীঠেই চলো। এর জন্য দুটো দিন দেরী হয় হোক।'

—বেশ চলো।

জানতাম বাধা দিয়ে লাভ হবে না।

আমার মুখের দিকে একটু কাল চেয়ে রইল ব্রততী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'রাগ করলে না তো?'

—রাগ করব কেন? তবে ভাবছি তোমার কষ্ট হবে।

—তা' হোক তুমি কিন্তু রাগ করো না। তুমি আমায় না বুঝলে কে বুঝবে বলো?

আবেগ মেশানো ওর কণ্ঠস্বর।

আমি নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে। অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে চেয়ে ও কি বুঝল ওই জানে। তবে ও আর কোনো কথা বলল না। একটুখানি হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অকারণেই আমার একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

সকালের বাসেই ছুটলাম তারাপীঠের পথে। বহরমপুর থেকে সাঁইথিয়া। সাঁইথিয়ায় বাস পাল্টে তারাপীঠের দিকে রওনা হলাম। বাস চলছে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে, সেই সঙ্গে বাসের ভেতরকার মানুষের কলকলানিও কম নয়। আমার ঠিক পাশে বসেছে এক বৃদ্ধ। পরণে হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লোকটি বার কয়েক আমার মুখের দিকে চাইল। তারপর চাইল ব্রততীর দিকে। তারপর আমায় প্রশ্ন করল, 'তোমরা কোথায় যেছো বাবা?'

একটু হেসে উত্তর দিলাম, 'যাব তারাপীঠ।'

—তারাপীঠে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার উত্তরে অদ্ভুত ভাবে ব্রততীর দিকে আর একবার চাইল লোকটি। তারপর দু'হাত জোড় করে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে, 'তারাপীঠ হল ক্ষ্যাপা বাবার স্থান। যাও বাবা পুণ্যি করে এইসো।'

একটু থেমে আবার বললে, 'বুঝলে বাবা ঐ তারাপীঠে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন আছে। বশিষ্ঠ দেব ঐ আসনে বইসেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ক্ষ্যাপা বাবা বলতেন, এ আসন বড় অদ্ভুত আসন। এই আসনে বসে জপ কইরতে পারলেই সিদ্ধি। কিন্তু সবাই কি এই আসনে বসে জপ কইরতে পারে? তেমন শক্তি না থাইকলে পারবে কেন? ডাবুকের ঐ কৈলাসপতি মহারাজের কথাই ধরোনা।

তিনিও তো এই আসনে বসে জপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন কি? বুঝলে, এই মহারাজ ছিলেন বীর সাধক। তিনি তাঁর ভৈরবীকে নিয়ে এই আসনে জপ করতে বইসলেন। সামনে শ্মশান। গভীর রাত। এক মনে জপ করছেন মহারাজ। হঠাৎ তাঁর মনে হল, কী একটা জন্তু পেছন থেকে জিব দিয়ে তাঁর পিঠ চেটে গেল। ব্যাস্। তারপরই মহারাজের তেড়ে জ্বর, আর সেই জ্বরেই শেষ। ক্ষ্যাপা বাবা ছিলেন সাক্ষাৎ শিব, তিনি যা পারেন সবাই কি তা' পারে?'

বৃদ্ধ চোখ বুজে চুপ করে রইল। বাসটা গোঁ গোঁ করে ছুটেই চলছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল বৃদ্ধ, 'এই যে আসন, এই আসনের কাছেই ছিল একটা শিমুল গাছ। কত কালের সেই গাছ কেউ জানে না। তা' একবার হল কী, ক্ষ্যাপা বাবা গাঁজা খেয়ে কল্কেটাকে উপুড় করে রেখেছেন ঐ গাছের গোড়ায়। গাঁজা খাওয়ার পর কল্কেতে আর কতটুকু আগুন থাকে বলো? তা' সেই আগুনেই বটগাছের মত ঐ বিশাল শিমুল গাছটা পুড়ে একেবারে ছাই। বোঝো কাণ্ড! বাবার মাহাত্ম্য কে বুঝতে পারে?'

আবার কিছুটা সময় কাটল নিঃশব্দে। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করল, 'বুঝলে বাবা, গোটা বীরভূম জেলাই তন্ত্র আচারের ঠাঁই। একান্ন পীঠের চারটে পীঠই তো এই জেলায়। এই যেমন ধরো গিয়ে, ফুল্লরা, কঙ্কালী, নন্দিকেশ্বরী আর ললাটেশ্বরী। তার উপর দুটি সিদ্ধপীঠ। বক্রেশ্বর আর তারাপীঠ। বুঝলে বাবা আমি এই বীরভূম জেলারই ছেলে। এককালে অনেক আশা ছিল। সংসারের জাঁতাকলে পড়ে কিছুই হল না। এ জন্ম বৃথাই গেল। তা' বাবা তোমাদের আর সব পীঠ দেখা হইয়েছে?'

—আজ্ঞে না।

—দেখে নাও। ঘুরে ঘুরে সব দেখে নাও। ঘুরবার মন যখন হয়েছে তখন আর থেমো না। বাবার আশীর্বাদ না পেলে কি

মন হয় ? বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। লোকটিও আর কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় বলল, 'এবার আমাকে নামতে হবে বাবা। কোটাসুরের ঝিল এসে গেছে। তোমাদের আরও খানিকটা যেতে হবে। তোমাদের যাবার পথে ডাবুকের কৈলাসপতির মন্দির পড়বে বাঁয়ে। তারপর ডানে পড়বে বীরচন্দ্রপুরের বাঁকারায় ঠাকুর। তারপর গিয়ে তারাপীঠ। দ্বারকা নদীর ধারে ক্ষ্যাপাবাবার সাধন পীঠ।'

ইতিমধ্যে বাস এসে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টপে। অনেকেই নেমে পড়ল। বৃদ্ধ লোকটিও তার জিনিষপত্র নিয়ে বাস থেকে নীচে নামল। বাসটা ছাড়তেই জানালা দিয়ে বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে হু'হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। বৃদ্ধ লোকটি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হু'হাত তুলল। কেন জানিনা, বৃদ্ধের জন্য কেমন একটু কষ্ট অনুভব করলাম।

তারাপীঠ এসে যখন পেঁাছলাম, তখন অনেক বেলা। তারামার মন্দিরের দিকে এগোতে এগোতে বৃদ্ধ লোকটির কথাই আবার মনে পড়ল।

তারামার মন্দিরে উঠে মায়ের দর্শন সেরে খানিকটা এদিক ওদিক দেখলাম, যদি শুভাশিসদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু না, এদিকটায় নেই। কাজেই মন্দির থেকে ফিরবার জন্য পা বাড়ালাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই একটা মিষ্টি গলার গান ভেসে এলো। চেয়ে দেখি, খানিকটা দূরে একজন সাধুগোছের লোক গান গাইছে, আর তার সামনে বসে রয়েছে জনা কয়েক সাধারণ মানুষ। ভক্ত। সাধু তন্ময় হয়ে গাইছে—

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশান বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

আর কোন সাধ নাই চিতে

চিতাভস্ম চারিভিতে

রেখেছি মা আসিস যদি।

গানটি শুনতে বেশ লাগছিল। তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটি গান থামিয়ে সকলের দিকে চাইল। বলতে লাগল, "অহং জ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। সেই শ্মশানেই তারা অর্থাৎ ত্রাণকারিনী বিদ্যার স্ফুরণ। তারপর? তারপর অনন্ত জ্যোতি, তখন সব কিছুতেই তারা দর্শন। তাইতো ক্ষ্যাপাবাবা বলতেন, 'তারা মা শ্মশানে' অর্থাৎ হৃদযে শ্মশান ভাব না জাগলে তারা সাধনা হয় না। হৃদয়ে শ্মশান ভাব জাগাতে হবে।"

ব্রততী আমার গায়ে আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, 'এভাবে দাঁড়ালে চলবে না। ওদের খুঁজে বার করতে হবে।'

—হ্যাঁ, চলো।

মন্দির থেকে ফিরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। শুভাশিস আর রোশেনারার বিবরণ দিয়ে মিশনের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। ভাবলাম, শ্মশানের দিকটা একবার দেখলে কেমন হয়। ব্রততীকে বললাম, 'চলো না একবার শ্মশানের দিকটা দেখে আসি।'

—চলো।

শ্মশানের দিকে খানিকটা এগোতেই মড়া পোড়াবার একটা উৎকট গন্ধ নাকে ভেসে এলো। ব্রততী মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে বললে, 'থাক না রথীদা, ওদিকটা গিয়ে আর কাজ নেই। শ্মশান তারপর জঙ্গল, ওদিকটা গিয়ে কি লাভ?'

চারদিকটা ভাল করে চেয়ে দেখলাম। দূরে দুটো চিতা জ্বলছে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে মানুষ আর পশুর হাড়, মাথার খুলি। ছেঁড়া মাদুর-বালিশ-বিছানা ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। আধ পোড়া শব নিয়ে কোথাও চলেছে কুকুরের

ভোজসভা। চারপাশটা চেয়ে দেখতে দেখতে ব্রততী আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চলো ফিরে যাই।'

সত্যি, এই বীভৎসতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানেই হয় না। ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ওদের খুঁজতে যাওয়াও অর্থহীন। ওরা যে এদিকে আসবেই সেটা নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। ভরসার মধ্যে গাজীবাবাজীর একটু ইঙ্গিত, ইন্দ্রজিত বাবু নাকি শ্মশানের ধারে জঙ্গলের মধ্যেই সাধনা করেন। কিন্তু এখানে এসে যতদূর শুনেছি তাতে তো মনে হল, অনেক সাধুই ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঝুপরি বেঁধে আছে। কাজেই এই অবস্থায় ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ব্রততীকে বললাম, 'ফিরেই চলো। মন্দিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক, তারপর দেখা যাবে।'

ফিরতে গিয়েই বাধা। কে যেন পেছন থেকে বললে, 'কি চাই আপনাদের?'

ব্রততী চমকে উঠে আমার হাতটা জোরে চেপে ধরল। সত্যি, চমকাবারই কথা। কাছে পিঠে জন-মানব নেই, অথচ দিব্যি মানুষের কণ্ঠস্বর। ঘুরে দাঁড়িয়ে চার দিকটা ভাল করে চেয়ে দেখলাম, নাঃ কেউ কোথাও নেই। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। পা বাড়াতেই কিন্তু আবার সেই কণ্ঠস্বর, 'কাকে খুঁজছেন বটে?'

অদূরে একটা বড় গাছ। তার নীচে দৃষ্টি পড়তেই ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হল। একজন অল্প বয়স্ক সাধু। গাছের নীচে বসে গাঁজা টানছে। গাছের আড়ালে ছিল বলেই এতক্ষণ নজর পড়েনি। গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। হাতে তার গাঁজার কল্কেটা ধরা। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম সাধুর কাছে। চোখ দুটো তার লাল টকটকে, মুখে কিন্তু হাসি। সাধুর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে

বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন। আমরা একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে খুঁজছি।'

—তা এখেনে কেনে। এই শ্মশানে? তারা কি মরে গেছে নাকি?

আরে বাবা, বলে কী! এ যে দেখছি নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছে। মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু সাধু ভুরু কুঁচকে কী একটু ভেবে নিজেই আবার বলল, 'না, মরা তো নয় জ্যান্তই বটে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। হ্যাঁ ঠিক। কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে ওই জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। এ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। ইন্দর ঠাকুর।'

—আরে আমরাও তো তাকে খুঁজছি।

ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে ব্রততী।

—খুঁজলেই কি পাওয়া যায়, এ্যাঁ? এই তো আমিও খুঁজছি, কিন্তু কই, পাই না তো।

মনে মনে ভাবলাম, এ তো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। কিন্তু লোকটা কিছু কিছু কথা ঠিক বলছে। কাজেই এড়িয়েও যাওয়া যায় না। এর কাছ থেকে আরও কিছু খবর পাওয়াও যেতে পারে। লোকটির কথায় ব্রততী কিন্তু কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আজ্ঞে তেমন করে খুঁজলে পাওয়া যায় বৈকী! মন প্রাণ ঢেলে খুঁজতে হবে।'

—এঃ! মন-প্রাণ ঢেলে খুঁজতে হবে! খুব বড় বড় কথা বইলছে! যত্ত সব শেখা বুলি! বলি কথাটার মানে জানা আছে? এ্যাঁ, মানে বোঝা হয়েছে?

সাধুর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে মনে ভাবলাম, ভারি ঝামেলায় ফেললে দেখছি। সাধুকে শান্ত করার জন্যে বলি, 'আজ্ঞে অন্য কোন খোঁজা নয়। ঐ ছেলে মেয়ে দুটোকে

খোঁজার কথা বলছি আর কি।'

—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ইন্দর ঠাকুরকে খুঁজতেছেন বটে।

সাধুর মুখে আবার হাসি ফোটে। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। সাধু জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বলে, 'জঙ্গলের ভিতর ঐ যে বড শিরীষ গাছটা দেখছেন, এরই কাছে রয়েছে একটা উঁচু টিবি। ওটাই ইন্দর ঠাকুরের আস্তানা। ছেলে মেয়ে দুটো ওদিকেই গেছে বটে। জয় মা তারা।'

সাধু গাঁজার কল্কেতে আবার একটা টান মারল। ঐ ফাঁকে আমরাও হাঁটা দিলাম ঐ জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলের ভেতর সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। বোঝা যায়, লোকজন যাওয়া আসা করে। আমরা শিরীষ গাছটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। কোথাও কোনো মানুষের সাড়া নেই। ব্রততী আস্তে বলল, 'এ ভাবে জঙ্গলের ভেতর ঢোকাটা কি ঠিক হল?'

—চলো, আর খানিকটা যাই। শিরীষ গাছের নীচটা দেখেই ফিরে যাব।

কথাটা শেষ করতে না করতেই কী একটা জন্তু আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, একটা শেয়াল। ব্রততী কেমন ভয়ে ভয়ে বলল, 'শেয়ালটা কি বিরাট দেখেছো।'

—হুঁ, মড়া খেয়ে খেয়ে দেহটাকে ঐ রকম বাগিয়েছে।

হাল্কা ভাবে উত্তর দি আমি। আমার হালকা ভাবটা কিন্তু ওকে একটুও স্পর্শ করল না। আর কয়েক পা এগিয়েই বললে, 'আমার কিন্তু আর এগোতে সাহস হচ্ছে না।'

—এতটা এসে ফিরে যাব? চলো না আর একটু দেখি।

আরও খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রততী।

আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললে, 'সামনে সাদা ওটা কি?'

সামনে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে

একটু দূরে দেখা গেল, কী একটা সাদা মত। একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল, একটি মানুষ। একজন নয়, দুজন। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর দুজন বসে আছে পাশাপাশি। আমাদের দিকে পেছন ফিরে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রততী আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আরে এ যে বেবী আর শুভমামা।'

ব্রততীর চিৎকার ওদের কানেও পৌঁছেছিল! পেছন ফিরে চেয়েছিল ওরা। হ্যাঁ শুভাশিস আর রোশেনারাই।

আমরা কাছে দাঁড়াতেই শুভাশিস বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলল, 'তোরা আবার এখানে আসতে গেলি কেন? কী যে করিস!'

—ব্রতী কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে চাইল না যে।

বললাম আমি।

—আমাদের খোঁজ পেলি কি করে?

—অনেক ঝামেলা করতে হয়েছে। সে কথা এখন থাক। কিন্তু তোর বাবা এখানে কোথায় থাকেন? শুনলাম, ইন্দর-ঠাকুরের আস্তানা কোন এক টিবির ওপর।

—হুঁ। ঐ যে ওদিকে টিবিটা দেখছিস ওরই ওপর বসে নাকি উনি সাধনা করেন। পাশে ঐ ঝুপরিটা বোধ হয় ওঁরই।

ধীরে ধীরে বলল শুভাশিস।

—উনি এখন কোথায়?

—বাইরে কোথায় গেছেন। কখন আসবেন জানি না। যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

—বেলা থাকতে থাকতে যদি না আসেন?

একটু ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করি আমি।

শুভাশিস আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার চোখের দিকে একবার চাইল। আর চোখের ভাষাটা আমার বুঝতে অসুবিধে হল না। ও যেন বলতে চাইছে, অতই যদি ভয়

তবে আসতে গেলি কেন? মনে মনে বললাম, তা' বটে।

নিঃশব্দে ওদের পাশে আমরাও স্থান করে নিলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বসে রইলাম চুপচাপ। এদিকে মশার কামড়ে পাগল হয়ে উঠেছি। সন্ধ্যা হতেও খুব একটা দেরী নেই। মনের ভেতর কেমন একটা আশঙ্কা, সত্যি সত্যিই সন্ধ্যের পরও এখানে থাকতে হবে নাকি? খুব বিশ্রী লাগছে। ভাবছি, এধরণের এ্যাডভেঞ্চারের কোনো মানে হয় না। আজ ফিরে গিয়ে কাল আবার চেষ্টা করাই উচিত। সাপ-খোপ, পোকা-মাকড় কতকিছু রয়েছে! এইভাবে রাত অবধি বসে থাকতে হবে! এর কোনো মানে নেই। মনে মনে এরকম সাত-পাঁচ ভাবছি। ভাবতে ভাবতে হয়তো একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম।

বসে থাকতে থাকতে শুভাশিস হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। দৃষ্টি সামনে। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, দীর্ঘদেহী এক সাধু। জঙ্গলের ওপাশ থেকে ঢিবিটার দিকেই এগিয়ে আসছেন তিনি। মাথায় জটা, লম্বা সাদা দাড়ি, খালি গা, পরনে টকটকে লাল কাপড়, কপালে সিঁদুরের বড় একটা টীপ। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর, সোজা এগিয়ে চলেছেন ঢিবিটার দিকে। শুভাশিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। চোখে ওর পলক পড়ছে না।

ব্রততীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম 'ইনিই কি তোমার জামাইবাবু?'

ফিস ফিস করেই উত্তর দিলে ব্রততী, 'তাইতো মনে হচ্ছে। তবে চেহারা অনেক পাল্টে গেছে।'

রোশেনারার দিকে চাইলাম, ওকে দেখে মনে হল, ও যেন মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে। স্থির হয়ে বসতে পারছে না।

ইতিমধ্যে সেই সাধুজী ঢিবিটার ওপরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেছেন। তিনি আসনে বসতেই হন হন করে সেই দিকে

এগিয়ে চলল শুভাশিস। শুভাশিস খানিকটা এগোতেই ওর দিকে দৃষ্টি পড়েছিল সাধুজীর। সাধুজী নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন শুভাশিসের দিকে। ততক্ষণে আমরাও শুভাশিসের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছি।

শুভাশিস সাধুজীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা কিছুটা তফাতে। সাধুজীর দৃষ্টি কিন্তু শুভাশিসের ওপর স্থির হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। শুভাশিস অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'বাবা!' ওর গলাটা যেন কেঁপে উঠল।

সাধুজী কোনো সাড়া দিলেন না। স্থির চোখে চেয়েই রইলেন।

শুভাশিস আবার ডাকল, 'বাবা আমি শুভ!'

—হুঁ, কিন্তু এখানে কি দরকার?

গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন সাধুজী।

—মুর্শিদাবাদের গাজীবাবাজীর কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে আসছি।

একটু ভয়ে ভয়েই উত্তর দিল শুভাশিস।

—কি দরকারে এসেছো?

ওইভাবে একই সুরে আবার প্রশ্ন করলেন সাধুজী।

—তোমার বাড়ি থেকে চলে আসার জন্যে আমিই তো দায়ী, আমিই তোমায় নিতে এসেছি। তুমি এবার ফিরে চলো বাবা।

শুভাশিসের কথায় সাধুজীর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। ঠোঁটের সে হাসি ছড়িয়ে পড়ল সাধুজীর চোখে, তারপর সমস্ত মুখে।

একটু কাল চুপ করে থেকেই সাধুজী জোরে হেসে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তুই কেন দায়ী হবি রে পাগলা? দায়ী তো আমার মা তারা! তিনিই তো তোকে দিয়ে আমার চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন।'

একটু হেসে আবার বললেন, 'তবে এসে ভালই করেছিস!

গাড়ী ব্যাটা ঠিক সময়েই পাঠিয়ে দিয়েছে। ও ব্যাটা ঐ রকম ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে আছে।'

কথাটা শেষ করে চোখ বুজে একটু হাসলেন ইন্দ্র ঠাকুর শুভাশিসের বাবা।

শুভাশিস এগিয়ে গিয়ে বাবার পায়ের ধূলো নিল। শুভাশিসের বাবা শুভাসিসের মাথায় দু'হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আশীর্বাদ করছি, তোর মন শান্ত হোক। তোর মনে শান্তি আসুক।'

শুভাশিসের দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে না বাবা? মা তোমার জন্যে—।'

—তোর মাকে বলিস, এখনও সময় হয়নি। সময় হলে নিজেই যাব।

আমরাও ততক্ষণে শুভাশিসের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ব্রততী সজল চোখে জামাইবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে বলল, 'জামাইবাবু আমরা বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম।'

—তুই অনেক বড় হয়েছিস রে। বেশ বেশ। সবাই তোরা শান্তিতে থাক, আনন্দে থাক।

ব্রততীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ইন্দ্রজিতবাবু। আমিও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আমার পরিচয় পেয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রোশেনারা এগিয়ে পায়ে হাত দিয়েও দিল না। মুখ তুলে খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'পায়ে হাত দেব?'

—কেন হাত দিবি না কেন?

হাসি মুখেই প্রশ্ন করলেন শুভাশিসের বাবা। তারপর কী ভেবে নিজেই বললেন, 'ওঃ, ছোঁয়া-ছুঁয়ির কথা বলছিস? কিন্তু মা, ভক্তির কাছে জাতের বিচার কি আছে? ভক্তির স্রোতে জাত-ধর্মের বিচার সব ভেসে যায় না?'

অদ্ভুত কথা! আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, এই মানুষটাই একদিন কিনা ব্যবসা-ব্যবসা, টাকা-টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছিলেন! আজকের এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে।

রোশেনারার চোখ দুটো জলে ভরে এলো। চোখের জলের ভেতর দিয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল, 'তাহলে ভক্তিই সব?'

—তাছাড়া কি? আর সেই জন্যেই তো তারা মায়ের কাছে কেবলই চাইতে হয়, 'শুদ্ধা ভক্তি দে মা, শুদ্ধা ভক্তি দে।' যার মনে ভক্তি আছে তার আবার ভাবনাটা কি?

রোশেনারা নিঃশব্দে পায়ের ধুলো মাথায় নিল। ওর চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে আবার বলল, 'আমাদের তবে কি হবে? সমাজ কি আমাদের মর্যাদা দেবে?'

শুভাশিসের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা বোধহয় স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে সাহস পেল না। তাই ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট ভাবে প্রশ্নটা করল।

শুভাশিসের বাবা একটুকাল স্থির চোখে রোশেনারার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মর্যাদা কেউ হাতে তুলে দেয় না। মর্যাদা আদায় করে নিতে হয়।'

এবার শুভাশিসের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা এখন যাও। অন্ধকার হয়ে আসছে, তোমাদের ফিরতে অসুবিধে হবে। আর আমারও সময় বয়ে যাচ্ছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমার আদেশ, আর কখনও তোমরা এখানে এসো না।'

কথা শেষ করেই চোখ বুজলেন শুভর বাবা। খানিকটা সময় কাটল। আবার চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল, তিনি যেন এই জগতের মানুষ নন, এই জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এক গভীর দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দুটো তাঁর আবার বুজে এলো।

কেমন যেন বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, 'মেরুদণ্ডের দুইধারে ঈড়া ও পিঙ্গলা। মধ্যে সুষুম্না নাড়ী। এদের নীচে আছে কুল কুণ্ডলিনী শক্তি। সর্বশক্তির আধার। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।'

বিড় বিড় করতে করতে হঠাৎই যেন থেমে গেলেন। একটু একটু করে স্থির নিশ্চল হয়ে গেল তাঁর দেহ। কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই। মনে হল, তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর ফিরল শুভাশিস। আমরাও পিছু নিলাম।

জঙ্গল ডিঙিয়ে, শ্মশান পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম পিচ ঢালা পথে। শুভাশিসকে বেশ প্রফুল্ল মনে হল। এ ক'দিন ওর মুখে যে বিমর্ষ ভাবটা দেখেছি, মনে হল, তা' একেবারে মুছে গেছে। সে জায়গায় ফুটে উঠেছে এক আনন্দের দীপ্তি।

নিঃশব্দেই হাঁটছিলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে শুভাশিস এক সময় বলল, 'ঈড়া-পিঙ্গল-সুষুম্না নাড়ী। এদের নীচে আছে কুল কুণ্ডলিনী শক্তি। সর্বশক্তির আধার। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।' বাবার এই কথার অর্থ কি?'

রোশেনারা আর ব্রততী শুভশিসের দুই পাশে। ওদের ঠিক পেছনে আমি। শুভাশিস কতকটা আপন মনেই কথাগুলো বলল। রোশেনারা আর ব্রততী এক সঙ্গেই শুভর মুখের দিকে চাইল। শুভাশিস নিজেই আবার বললে, 'আমরা তো ঈশ্বরকে পেতে আসিনি। বাবা তা' জানেন। সব জেনেও বাবা কেন একথা বললেন? আমার মনে হচ্ছে, বাবা যেন অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন—এক, দুই, তিন—অর্থাৎ বহু। বহু-র মধ্যেই আসল শক্তি। অর্থাৎ কোন মানুষ একা কিছু করতে পারে না, সমষ্টিগত শক্তিই সত্যিকারের শক্তি। সেই শক্তিকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। সেটাই হবে আসল কাজ।'

একটুকাল চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলবার মূল মন্ত্র কি, না, ভক্তি। কথাটা ধরতে পারছো তোমরা?'

আমাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই।

শুভাশিস হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাঁ হাত দিয়ে রোশেনারার একটা হাত চেপে ধরল। ডান হাত দিয়ে ধরল ব্রততীর একটা হাত। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনের দিকে এগোতে লাগল। আমিও এগিয়ে গিয়ে ব্রততীর একটা হাত ধরলাম। ব্রততী আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বিকেলের আলো তখন ফুরিয়ে গেছে, ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। রাস্তার ওপর দিয়ে আমরা চারজন এক রকম ছুটেই চলেছি। ছুটতে ছুটতে শুভ এক সময় বলল, 'কী যে আনন্দ হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না। বহুকাল এমন আনন্দের স্বাদ পাইনি। মনে হচ্ছে, ছেলে মানুষের মত ছুটোছুটি করে বেড়াই। বলতে বলতে সত্যি সত্যিই দৌড় শুরু করল। ফলে দৌড়তে হল আমাদেরও। আশ-পাশের লোকজন হাঁ করে দেখতে লাগল আমাদের। সকলের চোখে আমাদের এই দৌড়দৌড়িটা বোধ হয় বিষদৃশ ঠেকছিল। খানিকটা দৌড়েই শুভাশিস তাই থেমে গেল। বেশ হালকা গলাতেই বলল, 'আমাদের প্রাণ মাতানো উচ্ছ্বাসটা বোধ হয় এরা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। সবাই কেমন হাঁ করে দেখছে ছাখ।'

রোশেনারা মিষ্টি করে হেসে বলল, 'তোমার প্রাণের মাঝে যে সুধা আছে এরা বোধ হয় তার খবর পেয়ে গেছে। তাই সবাই হাঁ করে দেখছে।'

রোশেনারার হালকা কথায় সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম। অনেক দিন পর আবার এমনি করে সবাই মিলে হাসলাম আমরা। এমন প্রাণ খোলা হাসি যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

শুভাশিস বলল, 'এই মুহূর্তে শেলীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে করছে,—

"Man, one harmonious soul...
Man, not men !
a chain linked thought. Man equal,
unclassed, tribeless and nationless."

॥ দশ ॥

সেদিন রাত্রেই বহরমপুর পৌঁছলাম। পর দিন ফিরে এলাম কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে সবাই মিলে সোজা শুভাশিসদের বাড়ি। রোশেনারা অবশ্য ওদের বাড়ি যেতে মৃদু আপত্তি করল। কিন্তু শুভাশিস বা ব্রততী কেউই ওর সে আপত্তিতে কান দিল না।

শুভ-র মা আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে দেখে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর এমন একটা কথা বললেন যাতে আমাদের চমকে উঠবার কথা। বললেন, 'তোরা ও'র কোনো খবর পেলি নাকি?'

ব্রততী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আশ্চর্য! তুমি কি করে বুঝলে?'

হাসলেন শুভ-র মা। অদ্ভুত শান্তভাবে বললেন, 'মনে হল তাই বললাম। কেন মনে হল তা বলতে পারব না। সত্যি সত্যি দেখা পেয়েছিস নাকি?'

—হ্যাঁ পেয়েছি। বলছি সব।

বলল শুভাশিস।

আমরা বসলাম। শুভাশিস ধীরে ধীরে সব কিছুই বলল। গাজীবাবাজীর দেখা পাওয়া থেকে শুরু করে তারাপীঠে ইন্দ্র ঠাকুরের দেখা পাওয়া পর্যন্ত সব। শান্তভাবে সব শুনলেন শুভর মা। তারপর বললেন, 'আমিও ওঁর সঙ্গে দেখা করব শুভ। আমাকে নিয়ে চল্।'

—কিন্তু বাবা যে নিষেধ করেছেন।

অস্বস্তি বোধ করল শুভাশিস।

—এটা নিষেধ নয়। এ ও এক রকমের পরীক্ষা। এসব বোঝার মত তোর বয়েস হয় নি এখনও। উনি যদি কিছু বলেন তার দায় আমার।

এর ওপর কথা চলে না। বাধা দেবার প্রশ্নও ওঠে না কোনো শুভাশিসও বাধা দিল না।

দুদিন পর আবার সবাই যাত্রা করলাম তারাপীঠের দিকে। ভেবেছিলাম, রোশেনারার যাওয়া নিয়ে শুভর মা হয়তো প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু কার্যতঃ ব্যাপারটা উল্টো দাঁড়াল। যাওয়ার মুহূর্তে শুভর মা নিজেই রোশেনার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি কিন্তু মা সারাক্ষণ আমার পাশে পাশে থাকবে। মায়ের ওপর অভিমান করে দূরে দূরে থেকো না যেন।'

কথাটায় রোশেনারার চোখে জল এসে গেল কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে।

আমরা যখন তারাপীঠে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বিকেল। পড়ন্ত বেলার রোদ গাছের মাথায়। আমাদের মত আরও যাত্রী আছে। শুভর মা হাঁটছেন সবার আগে আগে, তাঁর যেন আর তর সইছে না।

মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে আমরা অবাক। শুভর বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমন একটা ভাব যেন কারও জন্য অপেক্ষা

করছেন তিনি। পোষাক সেই আগের দিনের মতোই। বাড়তির মধ্যে হাতে একটা পুঁটলী। আমরা কাছে যেতেই ওঁর চোখে মুখে একটা আনন্দের আলো খেলা করে গেল। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক স্বর্গীয় হাসি। শুভর মার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'আজ সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পথে হঠাৎ মনে হল, তোমরা আমার কাছেই আসছো। তাই যাওয়া হল না। ফিরে এলাম। এতক্ষণ তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

আমরা অভিভূত হয়ে শুভর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুভর মার মুখে কোনো কথা জোগাল না। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু চোখ ভরে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি মাথা নত করে স্বামীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন শুভাশিসের বাবা। মুখে স্বর্গীয় হাসিটি লেগেই রইল। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। শুভর মা স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এখনও বাড়ি ফেরার সময় হয় নি?'

—কিছু কাজ বাকী রয়ে গেছে যে। কাজ শেষ না হলে তো যেতে পারি না।

—কবে শেষ হবে কাজ?

—সে কথা তো বলতে পারি না। তাঁর যেদিন করুণা হবে। তাঁর করুণা ছাড়া তো কিছু হয় না।

বলতে বলতে শুভর বাবা শ্মশানের দিকে পা বাড়ালেন।

—চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। দেখা তো হল।

—যাবার আগে আমাকে কোনো উপদেশ দেবে না? কী উচিত, কী অনুচিত। ছেলেমেয়েদের কীসে ভাল হয়। সে সব কিছুই বলবে না?

—যা করবার তিনিই সব করবেন। সকলের যাতে ভাল হয় তিনি তো তাই করেন। তাঁর ওপর সব ভাবনা ছেড়ে দাও, দেখবে কোনো দুর্ভাবনা নেই। দেখবে জগৎ জুড়ে কেবল আনন্দ আছে!

—পারি না যে। কত রকমের আজে বাজে ভাবনা মাথায় আসে। শুভকে নিয়েই তো কত আজে বাজে ভাবনা ভেবেছি। তুমি তো সবই বোঝো, সবই জানো। আশীর্বাদ করো, মন স্থির করে যেন বাধামাধবকে ডাকতে পারি।

—আশীবাদ করছি, তোমার মন শান্ত হবে।

শুভর বাবা এবার শ্মশানের দিকে পা বাড়ালেন, একবারও আর পেছনে তাকালেন না।

॥ এগারো ॥

তারাপীঠ থেকে ফিরে শুভর মা কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। এতদিন যে বিষণ্ণতা তাঁর মুখে দেখেছি সেটা একেবারেই মুছে গেল। পরিবর্তে এক আনন্দের আভা ফুটে উঠল সেখানে। কেবল তাই নয়। রোশেনারা তাঁর বড় আপনজন, বড় কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়াল।

রোশেনারার মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। কেমন একটা ঔদাসীন্য ঘিরে ধরছিল ওকে। সব কিছুতে থেকেও যেন কিছুতেই নেই। একটা নির্লিপ্ত ভাব। কী এক ভাবনায় যেন মশগুল। কথায় কথায় একদিন বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, গোটা দেশের একটা বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে। অভাবনীয় পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ব্যাপারে আমারও কিছু কাজ থাকবে। তবে কী সেই কাজ বুঝতে পারি না। কী জাতীয় পরিবর্তন তাও ধরতে পারিনা। সামসুল ভাইকে আজকাল বড় বেশী মনে পড়ে। ওকে যদি একবার কাছে পেতাম!'

ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলাম আমরা।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হল। এর মধ্যে আমার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ব্যাপারটা নিতান্ত অভাবনীয় নয়। তবে বেশ শিহরণ জাগানো। বিয়ে হয়ে গেল আমার রত্নার সঙ্গে। শুভর মা নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলেন।

আগে থেকেই স্থির ছিল, বিয়ের পর সবাই এক সঙ্গে বেড়াতে যাব। কিন্তু তা হল না। এমন করে যে বাধাটা আসবে একটা

দিন আগেও বুঝতে পারিনি। যাবার আগের দিন বিকেলে লেটার বক্সে একটা চিঠি পেলাম। চিঠি পোস্টে আসে নি। কেউ হাতে ফেলে গেছে। চিঠিটায় লেখা, 'রথী, আর বসে থাকতে পারছি না। ওপার বাঙলায় মুক্তি যুদ্ধ চলছে। এপার বাঙলায় চুপ করে বসে আমি তা দেখতে পারব না। দবীর খাঁর বংশে আমার জন্ম। বাঙালীর এই মুক্তি যুদ্ধে আমাকে কিছু করতেই হবে। আর কিছু না হোক মরতে তো পারব। আমার মনের নিভৃত কোণে সামসুল ভাই-এর ডাক শুনতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি দবীর খাঁর ডাকও। আমার রক্ত নাচছে। স্থির থাকতে পারছি না। শুভ্রকে চিঠিটা দেখিও। ব্রততীকে বুঝিয়ে বোলো। মাসীমাকে দুঃখ করতে বারণ কোরো। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলাম। তোমাদের জানাই নি বলে রাগ করো না। জানালে তোমরা বাধা দিতে। চললাম। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।' নীচে রোশেনারার সই।

চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। ব্রততী চিঠিটা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেলল।

সত্যিই রোশেনারাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। যে মেয়ে স্বেচ্ছায় হারিয়ে গেছে, তাকে যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তা অবশ্য ধরেই নিয়েছিলাম। তবু আমরা চেষ্টা না করে পারিনি। থানা পুলিশের মাধ্যমে অনেক খোঁজাখুজি হল। সম্ভব অসম্ভব নানা জায়গায় দৌড় ঝাপ করা হল। কিন্তু ফল যা হবার তাই হল। কেউ রোশেনারার খোঁজ দিতে পারল না।

এদিকে ওপার বাংলায় যুদ্ধের প্রকৃতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠল। সেই একুশে ফেব্রুয়ারী পূব বাংলার মাটীতে সালাম-বরকতরা জাতীয়তার যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল, এত দিনে সেই বীজ অঙ্কুর গজিয়ে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এখন আর তাকে উপড়ে ফেলার সাধ্য সরকারের নেই। সরকার বাহাদুর এখন যত গোলাগুলি ছুঁড়ছে ওপার বাংলার মানুষ তত মরীয়া হয়ে উঠছে। বাঙালীর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে তারা আজ সর্বস্ব পণ করে লড়ছে। ওপার বাংলার মানুষের কণ্ঠে আজ একটাই আওয়াজ, 'যার যা আছে তাই নিয়ে লড়ো।' তারা আজ দলে দলে মরছে। না মেরে মরছে না। হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে—তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছে। বাংলার শ্যামল মাটি রক্তে লাল হয়ে হয়ে আরো যেন উর্বর হয়ে উঠছে। রক্তের নেশায় লাল হয়ে উঠেছে মেঘনা-পদ্মা-বুড়ি গঙ্গার জল। সেই মত্ত জলের ধাক্কা এসে লাগছে এপার বাংলায় গঙ্গার বুকে। উভয় বাংলার মানুষ একই আবেগে দুলছে, রাগে ফুঁসছে। হিন্দু মুসলমানের বিভেদের প্রাচীর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে যেন।

রোশেনারা চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা যেন যন্ত্রের মতন হয়ে গিয়েছিলাম। সব কিছুই চলছে, অথচ প্রাণের ছোঁয়া নেই কোনো কিছুতে। শুভাশিসও আগের মতই কলেজ করছে। সপ্তাহান্তে কলকাতায় আসছে। কিন্তু এ যেন সেই শুভাশিস নয়, তার ছায়া মাত্র।

দিন গুলো গড়িয়ে গড়িয়েই চলছিল। শীতের অলস বেলার মতন গড়িমসি করতে করতে। অপেক্ষা করা ভিন্ন আমাদের যেন আর কিছু করার নেই। কিন্তু এই অলসতটুকুও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সেদিনের কাগজের একটা রিপোর্ট। খবরের কাগজের একেবারে প্রথম পাতায় খবরটা বেরিয়েছে। ওপার বাঙলায় রোশেনারা নামে একটি মেয়ে সাহসিকতার এক অভূত পূর্ব নজির

রেখেছে। সে নিজের জীবন তুচ্ছ করে গ্রেনেডের সাহায্যে একা একটি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

খবরটা পড়ে চমকে উঠলাম। কে এই রোশেনারা? ওই কি তাহলে আমাদের বেবী?

খবরটা শুভর চোখেও পড়েছিল। কিন্তু ওর অভিব্যক্তিতে কোনো কিছু প্রকাশ পেল না। বরং আমি যখন খবরটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, উদাসভাবে ও তখন বলল, 'চল্ আজ গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি।' ওর এই ঔদাসীন্য আমার ভাল লাগল না। একটু আঘাতই করল যেন।

অনিচ্ছা সত্বেও গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতে হল। গেলাম অবশ্য তিন জনেই। আমি, ব্রততী এবং শুভাশিস।

ব্যারাকপুরে গঙ্গার এদিকটায় আরো কয়েকবার এসেছি। কিন্তু সে আসা ছিল অন্য রকম। তখন চারজনে মিলে হৈ হৈ করে পিকনিক করতে আসতাম। এবার এলাম যেন অপরাধীর মতন। পায়ে পায়ে।

একটা ঝুপসি মতন গাছের নীচে গিয়ে বসলাম আমরা। পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর তখন গাছের মাথায় লেপ্টে আছে। মাটীর বুকে লম্বা হয়ে পড়েছে গাছের ছায়া। আমরা এসে বসলাম যেন মুখে কুলুপ এঁটে। কারো মুখে কোন কথা জোগাল না। কোনো রকমে নিজেদের দেহটাই বয়ে আনা হয়েছে যেন। আমাদের কাছাকাছি একটা ঘন ঝোপ। সেই ঝোপে রঙ বেরঙের অসংখ্য বুনো ফুল ফুটে আছে। সেই ফুলের ওপর এক ঝাঁক প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে বসছে। ব্রততী ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, প্রাণপণে ও নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু চোখের জলের ধারাকে বাগ মানাতে পারছে না কিছুতেই। শুভাশিসের

মুখেও কোনো কথা নেই। গঙ্গার বুকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

নিঃশব্দে সময় বয়ে চলল। মাটির বুকে গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। গাছের মাথায় সোনালী রোদ্দুর ফিকে হতে লাগল ক্রমশঃ। এমন সময় আমার মুখ থেকে বেমক্কা একটা কথা বেরিয়ে গেল। কতকটা আপন মনেই বললাম, 'মেয়েটা যেন আমাদের বোকা বানিয়ে গেল। পালিয়ে যাবার এমন প্ল্যান, অথচ দুদিন আগেও বুঝতে দেয়নি।'

আমার কথায় কী এমন ছিল জানি না। কথাটা শুনে ব্রততী কিন্তু সশব্দে কেঁদে উঠল। সেই সঙ্গে শুভাশিসের চোয়াল দুটো বার কয়েক শক্ত হয়ে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে সে কেবল বলল, 'এস্‌কেপিস্ট্। ও পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।'

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর উঠে পড়লাম আমরা। নৈঃশব্দের প্রাচীর তখনো আমাদের ঘিরে রেখেছে।

এর মধ্যে একটা চিঠি এল। মুক্তি ফৌজের কারও হাতের লেখা। রোশেনারাকে বীরাঙ্গনার সম্মান দিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। অনেক বিশেষণ। বাংলার মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে রোশেনারার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আরও কী কী সব কথা। আমার মাথায় কিন্তু কিছুই ঢুকল না। পড়তে পড়তে কান দুটো ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

চিঠিটা এসেছিল রোশেনারার বাড়ির ঠিকানায়। রোশেনারার

মা আমাদের হাতে চিঠিটা তুলে দিতে দিতে কেঁদে ফেলেছিলেন। চিঠি পড়া শেষ করে আমরা আর তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। একরকম পালিয়েই এসেছিলাম। সালেমা বেগম হয়ত সত্যি সত্যিই আহত হয়েছিলেন।

একদিন ওপার বাঙলার যুদ্ধ থামল। জন্ম হল স্বাধীন বাঙলা দেশের। দেশে দেশে আলোড়ন পড়ে গেল। কাগজে কাগজে টেল বিস্ফোরণ। ব্রততী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, 'সব হল। কেবল আজো ফিরে এল না আমাদের বেবী।'

শুভ কোনো কথা বলল না। উদ্‌গত কান্না প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করল। আমার মনে হতে লাগল, বাঙলার এই নবজাগরণের দিনে দবীর খাঁর শেষ বংশধরের আত্ম বলিদানের হয়তো কোনো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোনো কথা না বলে মুক্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল।

—: সমাপ্ত :—